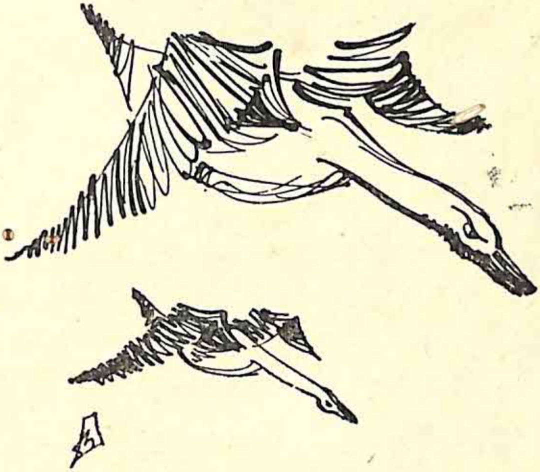


চলো যাই

অমিয় চক্রবর্তী





নিখিল ভারত নবম (১৯৬৩) শিশু সাহিত্য প্রতিযোগিতায় ভারত সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ কিশোর সাহিত্যরূপে পুরস্কৃত এবং তৃতীয় য়ুনেস্কো প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত।

চলো যাই

অমিয় চক্রবর্তী

শ্রীপ্রকাশ ভবন
এ ৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৬৯
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৭১

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
এ ৬৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা ১২

চিত্রশিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
বর্ণলিপি
চিত্ত সরকার

মুদ্রাকর
কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১ কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলকাতা ৬

তিন টাকা

মিতা-কে—

বড়ো হলে পড়বে।

CHALO JAI

Dr. Amiya Chakraborty

Rs. 3·00



সাইগনের ক্সো-লাই বৌদ্ধমন্দিরে লেখক

ভূমিকা

ভ্রমণের যে চলচ্ছবি আমার চোখে-মনে ধরা পড়েছিলো, একদা তার কিছু পরিচয় দিয়েছিলাম রং-মশাল পত্রিকায়। সম্পাদক কামাক্ষীপ্রসাদের উৎসাহে কয়েক মাস ধরে ক্ষুদ্র রঙিন চিত্রমালা বার হয়েছিলো ; যেমন দেওয়ালে টাঙানো হঠাৎ আঁকা খেয়ালি ছবি। কোন্ দেশ বাদ পড়লো, লেখার পরে কোন্ সমাজ বা রাষ্ট্রের ধারা বদ্‌লে গেলো, ক্ষুদ্র রচনায় তার কোনো হিসাব রাখিনি। রং-মশাল কাগজটি আজ লুপ্ত, কিন্তু পুরোনো স্মৃতির আমেজ মনে জেগে আছে। হয়তো বা আজকের নবীন পাঠকরা এই ভ্রামণিক চিত্রগুলোতে কিছু স্বাদ পাবে যা রাষ্ট্রিক তথ্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল নয়।

সামান্য কিছু সংস্কার করেছি কিন্তু নতুন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে পূর্ব দৃশ্যগুলোকে মেলাবার চেষ্টা করিনি। তার কারণ "চলো যাই"-এর উদ্দেশ্য পথে বেরোনো, প্রাণের বা নির্দিষ্ট গন্তব্যের কথাটা গৌণ। স্বল্পদিনের জন্য স্বদেশে ফিরে আবার বাইরে চলেছি, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের বলে যাই তোমরাও কি আসবে?

মনে রাখা দরকার ভ্রমণ বৃত্তির জন্য দূরে যেতে হয় না, কাছে আসতে হয়—নানাদেশের এবং আপন মানুষের কাছে।

কলকাতা
৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬২

অমিয় চক্রবর্তী

পুনশ্চ :

কিছু নতুন লেখা যোগ হলো। 'চলো যাই' এর তো শেষ নেই, আরো দু-চারটে দেশে ঘুরে আসতে খুব বেশী সময় লাগেনি। হয়তো আবার কোনো শোভন সংস্করণে ভবিষ্যত্যের ভ্রমণমালা বেড়ে যাবে।

বস্টন। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

অমিয় চক্রবর্তী



ইরাণে

রবীন্দ্রনাথ উড়েছিলেন বায়ুতরীতে ; তোমরা জানো, ইরাণের সম্রাট তাঁর জন্য কলকাতা থেকে হাওয়ায় যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরাও কয়েকজন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তোমরাও যদি কেউ সঙ্গে থাকতে তো দেখতে শেষরাতের তারা-ভরা আকাশ, দমদম এরোড্রোমে অগণ্য লাল-নীল বাতি জ্বলছে। হঠাৎ দুরন্ত পাখার ঝাপটা দিয়ে প্রকাণ্ড আকাশ-পাখি উপরে উঠলো, নীচে —অনেক নীচে মায়াময় বাংলার মাটি। সরে সরে যাচ্ছে গাছ, মাঠ, চৌকো বাড়ি, ছায়াচ্ছন্ন গঙ্গা নদী। তারপর রাঙা-সূর্য প্রকাণ্ড একটা ফানুসের মতো নীল শূন্যে ভেসে এলো, ভারতভূমির উপর ছড়িয়ে দিলো জ্যোতির স্বচ্ছ আবরণ। আরো উপরে উঠলো আমাদের রূপোলি জ্বলজ্বলে পাখি—ছোটোনাগপুর, বিহার পার হয়ে আমরা যুক্তপ্রদেশের দিকে চলেছি। অনেকটা যেন ভুলে যাচ্ছি নীচে কোন্ মহাদেশ, শুধু মনে হচ্ছে—আমাদের পৃথিবী ঐ দূরতলে, বসুন্ধরার কোল ছেড়ে এ কোথায় আমরা মেঘে মেঘে অদৃশ্য নীল পথে, রশ্মি পথে চলে যাচ্ছি।

করাচী। শেষে ভারতবর্ষের সীমান্ত পার হয়ে কখনো দেখি তামা-রঙের শিং তোলা পাহাড়শ্রেণী ; রুক্ষ বেলুচিস্তানের মাটি ফুঁড়ে ভূমিকম্পের দৈত্য যেন তাদের ঠেলে তুলেছে। আবার কখনো দেখি সুদূর পর্যন্ত নীল আস্তরণ, সমুদ্রের মস্ত জাজিম পাতা। ঢেউ দেখা যায় না, কিন্তু সবই একটু নড়ছে, আর ঐ যে ছোট্ট ছোট্ট শাদা কী যেন চলেছে—ওগুলো জাহাজ। জাহাজও চলেছে ইরাণের দিকে, মধ্যে হয়তো বন্দর আব্বাস, মস্কট, বেহরিণ প্রভৃতি আরব্য প্রান্তভূমির বন্দরে থামবে।

কিন্তু আমরা ইরাণে চলছি নব্য যুগের নতুন পুষ্পকরথে, আমাদের সঙ্গে কে পারবে? জাহাজগুলোকে বলতে পারো মন্থর জলচর অদ্ভুত গোছের মাছ, উঁচু নাক দিয়ে বাষ্প নিঃশ্বাস ফেলতে পারে, উড়তে পারে না তো! ঢেউয়ের ঝাঁকুনি বেশী হলে ভয়ে ভয়ে তীরের মাটি আঁকড়ে নোঙর ফেলে শুয়ে থাকে।........এই সব ভাবছি, এমন সময়ে ঘটলো এক ব্যাপার।

এরোপ্লেনের বেতার যান্ত্রিক—দীর্ঘাকৃতি ওলন্দাজ ব্যক্তি—যে সর্বদা দুই কানে টেলিফোনের কালো চাকতির মতো কী একটা প'রে বসে থাকে—সে খুব সম্ভ্রমে, উৎসাহে, দ্রুত এসে রবীন্দ্রনাথের হাতে একটা কাগজ দিয়ে গেলো। রবীন্দ্রনাথ ইরাণের আকাশে প্রবেশ করেছেন। অদৃশ্য সীমান্ত পার হয়ে যেখান দিয়ে যাচ্ছেন তার নীচে এখন থেকে ইরাণের মাটি। তাই সম্রাট রিজা শা পহ্লবী রবীন্দ্রনাথকে অভিবাদন পাঠিয়েছেন। একেই বলে প্রাচ্য আতিথ্য। এরকম করে য়ুরোপের তো কেউ অভ্যর্থনা জানাবার কথা ভাবেনি। প্রবীণ এসিয়ার যেখানে যথার্থ স্বাধীনতার মন্ত্র জেগেছে, সেখানে সে পুরোনো ভদ্রতাকে কেমন করে নতুন যুগের রীতির সঙ্গে মেলাতে পারে তাই দেখো।

কিন্তু কৈ, চলন্ত পথের তলে তো ইরাণীবাগান, শ্যামল আন্দোলিত শৈল শহর, ঝর্ণার ঝিলিমিলি দেখা যাচ্ছে না? এতো খরখরে মাটি চ্যাপ্‌টা চৌকো ছাতঅলা বিক্ষিপ্ত কুটীর, যেমন দেখেছিলাম ভারতের সীমান্ত প্রদেশের, সিন্ধু দেশের পল্লীতে। তার কারণ এই যে, ইরাণ যে সবটাই শিরাজ ইস্পাহান, তেহেরাণের গোলাপ বাগান নয় ইরাণের বেশীর ভাগই যে মরুভূমি। মধ্যে মধ্যে মাটি ওয়েশিসের মতো চিরবাসন্তিক; বুলবুল ডাকা ছোট্ট ছোট্ট পার্বত্য শহর। খোরাসানের মরুভূমি, আর পপ্‌লার্-উইলো-মর্মরিত কুঞ্জকানন। ধুলোবালিভরা পাথুরে উঁচু-নীচু গরম পথ ভেঙে যখন ইরাণের কোনো একটি ঠাণ্ডা শহরে আসা যায়, তখন মনে হয়, সত্যি যেন স্বর্গে পোঁচেছি। পাঁচ-ছয়-সাত হাজার বর্গফিট উঁচু অগণ্য কাশ্মীরি শৈলাবাস ইরাণে ছড়ানো আছে। ভারতবর্ষের চেয়ে ক্ষুদ্রায়তন দেশ বলে শ্যামল উঁচু উপত্যকা আর পাহাড়গুলো আরো কাছাকাছি পাওয়া যায়। স্বর্গ আর নরক—আরামের দিক থেকে বলছি—ঘেঁষাঘেঁষি রয়েছে। উঁচুতে উঠলেই বাগিচা, সৌধ, কবিতা ও বাগানের ঝর্ণা বওয়ানো ইরাণ; নীচে চলেছে কালো ক্যারাভান, উড়ছে মরুভূমির বালি, তীব্র সূর্যজ্বলা মধ্য এসিয়ার ভূখণ্ড।

বেলুচিস্তান থেকে উড়ে আমরা নামলাম ছোট্ট একটি ইরাণী দ্বীপে। এর নাম জস্ক্‌। বায়ুতরী দিয়ে ইরাণে যেতে এইটেই তখন ছিলো প্রথম ইরাণী দরজা। তারপর বড়ো সদর দরজা হলো বুশীর।

সমুদ্রবেষ্টিত এই গরম দ্বীপটিতে রাত্রিবাস করে ভোরেই আবার উড়ে চললাম বুশীর শহরের দিকে।

এই তো ইরাণী মস্ত এরোড্রোম। ঘর্‌ঘর্‌ করে হাওয়াই পাখিটা নামলো ডাঙায়। বন্দরটা প্রাচীন এবং ব্যবসায়ের বড়ো কেন্দ্র। এখানেও মরুভূমির হাওয়াই প্রধান; বুলবুলের চিহ্ন নেই—মনে

রাখতে হবে আমরা চলেছি ভরা গ্রীষ্মের সময়—কিন্তু প্রতিবেশী ইরাণের প্রাণস্পর্শ এখানে পাওয়া গেলো। কতোরকম লোকজন (নতুন ইরাণের গোল-টুপি প্রায় সবার মাথায়) আর বিচিত্র প্রকারের বাড়ি-ঘর, বাজার। মোটরও চলেছে, উটও চলছে, আবার উপরে এরোপ্লেন। ঐ যে রাস্তা, ওটা গেছে শিরাজের দিকে। হাফিজ, শাদির শিরাজ; গোলাপ, বুলবুল আর আঙুরের কানন শিরাজ। গালিচা আর রূপোর বাসনের শিরাজ। কতোদিনের বিগত স্বপ্ন জড়িয়ে আছে শিরাজকে ঘিরে। আজো তার ঐশ্বর্য ফুটে আছে—পরে তা দেখলাম। শিরাজের ফল, ফুল, শরবৎ, সেতারের বাজনা—কোথায় তার তুলনা! মনে হলো, ম্যাজিক কার্পেটে চড়ে এ কী আশ্চর্য দেশে এসেছি।

কিন্তু এখন মনে হবার সময় নেই। রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করতে কতো লোক এসেছেন। এরোপ্লেন যেখানে থামলো, সেখানে রাজপ্রতিনিধি দাঁড়িয়ে। ভারতীয় কবিকে সম্মান জানাতে সম্রাটের কতো গৌরব। ভারতবর্ষেরও একদিন এমনি ছিলো।

আমাদের তিনদিনের বন্ধু আকাশ-পাখিটাকে পিছনে ফেলে যেতে মন কেমন করছিলো।

ঐ রকম একটা পাখি পেলে তোমরাও কি বলবেনা—চলো যাই ইরাণে? যদি যেতে চাও, আমিও আবার তোমাদের সঙ্গে যাবো।



ফিন্‌ল্যাণ্ডে

এই তো এসেছি সুয়োমি রাজ্যে। কোথায় বলো তো? এই দেশের আরেক নাম হলো ফিন্‌ল্যাণ্ড। সেটা নিশ্চয়ই জানো। তা ছাড়া আরো একটা অন্য রকম নাম আছে—"হাজারটা হ্রদের দেশ"। তার কারণ ফিন্‌ল্যাণ্ড কেবলি ছোটো ছোটো দ্বীপ, হ্রদ আর সমুদ্রে ভরা। তাহলে ফিন্‌রা থাকে কেমন করে?—দেশটার নাম থেকে তো শেষ অংশ বাদ দিলেই চলে? ঠিক তা নয় কিন্তু। ঐ দ্বীপগুলো জুড়ে জুড়ে ডাঙা যথেষ্টই আছে, ঘন পাইন অরণ্যে ভরা। উত্তর ফিন্‌ল্যাণ্ড আর্ক্‌টিক অর্থাৎ সুমেরু প্রদেশের অন্তর্গত। শীত আর বরফ লেগেই আছে, খুব উত্তরে তো গাছপালা। সেখানে ফিন্‌দেশীয় এস্‌কিমো ল্যাপ্‌দের বাস। সারা দেশ জুড়ে এক সময়ে ল্যাপ্‌দের আধিপত্য ছিলো, অর্থাৎ আট খৃষ্টাব্দে বলটিক্ সমুদ্রের দক্ষিণ তটের দিক থেকে ফিন্‌রা এসে ল্যাপ্‌দের উত্তরে ঠেলে দিলো—এরাই রয়ে গেলো দেশের কর্তা হয়ে।

কিন্তু ফিন্‌দেরও শান্তি হয়নি। অমন ছবির মতো দেশে সুন্দর শহর বানিয়ে, আশ্চর্য সঙ্গীত আর স্থাপত্য সৃষ্টি করেও তাদের কপালে

সুখ হলো না। ফিন্‌দের ইতিহাস অন্যদের আক্রমণ কাহিনীতে ভরা। ফিন্‌ল্যাণ্ডের অবস্থা হচ্ছে বড়ো বড়ো দৈত্যরাজ্যের মধ্যে প'ড়ে ছোট্ট দেশের যা হয়, তাই। এপাশে গর্জন, ওপাশে গর্জন, কোন্ প্রচণ্ড বহিঃশক্তিকে সে সামলাবে বলো? ফিন্‌ল্যাণ্ড তবু বারে বারে মাথা তুলে উঠেছে।

দেখ তো, অতোটুকু দেশের কী স্বাধীন শক্তি! অপরাজেয় ফিন্‌ল্যাণ্ডের জয় হোক! তোমরা কেউ পারো তো সুইডেন থেকে ষ্টীমারে করে হাজার দ্বীপের দেশে গিয়ে প্রাণ ভরে সৌন্দর্য আর স্বাধীনতার মন্ত্র নিয়ে এসো। ষ্টীমারগুলো স্টকহল্‌ম্-এর ঘাট থেকে ছাড়ে, আর বারো ঘণ্টা ধরে এ-দ্বীপ, ও-দ্বীপ পাশ কাটিয়ে চলে। কোনো দ্বীপে লাল টালি দেওয়া দু-চারটে বাড়ি আর গাছ, কোথাও মনে হয় শুধু চাষের ক্ষেত, মানুষ একটিও নেই, কোথাও দু-দশ হাত দ্বীপের মধ্যে একটি গীর্জা, গোটা কয়েক বাড়ি-বাগান, ঘোড়া-ছাগল। আর দেখা যায় হাসি-খুশি লোকজন ছোট্ট ঘাটে এসে নৌকো চড়ছে। সুইডেন থেকে ষ্টীমারে মজার ব্যবস্থা—বাজনা বাজছে, নিশান উড়ছে। আর খাবার ঘরে হাজার রকমের খাবার সাজানো। একটা টিকিট কিনে ঘরে ঢুকে যা ইচ্ছে তাই খাও। যেমন সুইডেন বা ডেন্‌মার্কে—এখানেও তাই, কতোরকম যে স্যাণ্ডুইচ্ তার ঠিক নেই। মাখন মাখানো নরম রুটির উপর কতো রঙের ফলের টুকরো সাজানো। যতো কিছু তরি-তরকারী, মাছ-মাংস-পনীর আছে, সব রকম দিয়েই সুন্দর দেখতে স্যাণ্ডুইচ্ তৈরী করে ওরা সাজিয়ে রাখে; সঙ্গে ক্রীম, আইস ক্রীম, স্যালাড্। নোন্‌তা, মিষ্টি, ঠাণ্ডা-গরম খাবারের হাট বসে গেছে। বলাবাহুল্য যতো ইচ্ছে যা ইচ্ছে খাওয়া যায় বলেই লোকে যে কেবলি খেতে থাকে তা নয়। যে যেমন ইচ্ছে বাছাই করে নেয়। রোজ এমনি ঘরে ঢুকে টেবিলে

সাজানো নানারকম খাবার যা ইচ্ছে খাচ্ছি আর জানলা দিয়ে দেখছি—দ্বীপের পর দ্বীপ চলে যাচ্ছে, আর শুনছি ডেকের উপর বাজনা বাজছে—সিন্ধুপাখি উড়ে যাচ্ছে—এ একটা মনে রাখবার মতো অভিজ্ঞতা।

যখন টুর্কোর কাছে পৌঁচেছি—ফিন্‌ল্যাণ্ডের এই প্রথম বন্দর—তখন সকালের আলো নীল ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঝল্‌মল্ করছে, আর টুর্কো শহরের একটা টিলা দেখা যাচ্ছে, তার উপর প্রাচীন শিবির। সেখানে সুয়োমি রাজ্যের পতাকা সোনালী হাওয়ায় দুলছে। তীরে পৌঁছবার আগে জাহাজে শুনলাম ফিন্‌ল্যাণ্ডিয়া সঙ্গীত। সিবেলিউস—যিনি ফিন্‌ল্যাণ্ডিয়া রচনা করেছেন, তিনি হলেন ফিন্‌ল্যাণ্ডের এবং আধুনিক য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-স্রষ্টার একজন। ফিন্‌ল্যাণ্ডের অতি আশ্চর্য গম্ভীর শান্ত সঙ্গীত। তাতে নিবিড় অরণ্যের ধ্বনি শোনা যায়, ফিন্‌ল্যাণ্ডের বৃহৎ একাকিত্ব, তার ইতিহাসের কতো বেদনা মনে বাজতে থাকে। হেলসিংকি থেকে একদিন ত্রিশ মাইল দূরে ঐ মহাসাঙ্গীতিক সিবেলিউস-এর কাছে দুপুর কাটাতে গিয়েছিলাম। ফিন্‌ল্যাণ্ডিয়ার অরণ্য-মর্মর আর সুরের মধ্যে মানুষের যুগ-যুগ-ব্যাপী মুক্তি সংগ্রামের ব্যঞ্জনা শুনতে পেয়েছি জেনে তিনি ভারি খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, মুক্তির বেদনা তাঁর সঙ্গীতে আছে। এবং তার চেয়েও বড়ো—মানুষের মুক্তি, যা দেশের চেয়েও সত্য। সঙ্গীত তাঁর কথা বলে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি দেখেননি, কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে কতো গভীর আনন্দ পান তা বললেন। ধব্‌ধবে শাদা চুল, সুন্দর চেহারা সিবেলিউসের—দেখলেই মনে হয় প্রতিভাবান পুরুষ। মনে পড়ছে, সেই দুপুরে সোনালী ঠাণ্ডা আকাশে কতো শাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছিলো। মোটরের রাস্তা চলে গেছে সবুজ হল্‌দে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। দূরে দূরে

উঁচু নীল পাইন বন। বড়ো গাছের সারি দেওয়া পরিচ্ছন্ন গ্রাম। আর যেদিকে তাকাও, সেদিকেই একটু ইস্পাতি ঝিকিমিকি জল— হ্রদ তো থাকবেই।

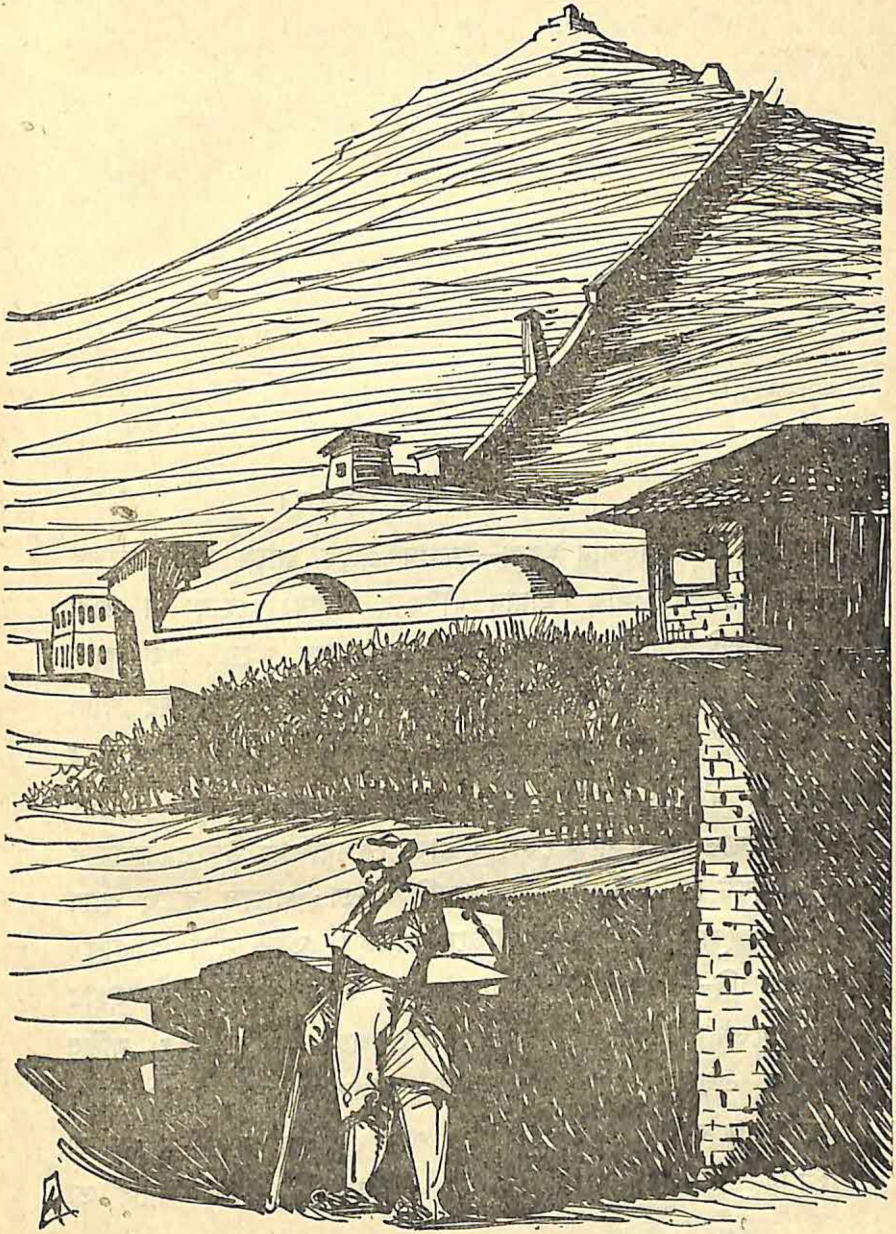
ফিন্‌দের সবচেয়ে বড়ো কারবার হচ্ছে কাগজের—যুদ্ধের আগে আমাদের দেশেও সুইডেন আর ফিন্‌ল্যাণ্ড থেকে সুন্দর বই ছাপাবার কাগজ এসে পৌঁছত। অরণ্যবহুল দেশে নানান রকম কাগজ তৈরী করা সহজ, তাছাড়া ফিন্‌রা জলের শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তি ক'রে তুলেছে—দেশ জুড়ে তাই ওদের কলকারখানা চলেছে, অতটুকু দেশের ঐশ্বর্য সহস্রগুণ ফলে উঠেছে। শুনলে আশ্চর্য হবে, সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বইয়ের দোকান ইংলণ্ড বা জর্মানিতে নয়—ফিন্‌ল্যাণ্ডে। হেলসিংকির বইয়ের দোকান দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেটা যেন অট্টালিকার মতো। আর তাতে বহু ভাষার বই বিক্রীর জন্যে সাজানো আছে। হেলসিংকিতে বসে ভারতবর্ষের নানা রকম বই এক জায়গায় দেখে মন যে কত খুশি হলো, কী বলবো।

এই দূর কোনখানকার ফিন্‌ল্যাণ্ড—আমাদের মনে হয় উদীচ্য বৃত্তের অন্তর্গত সে এক অগম্য দেশ। বিশেষ ক'রে উত্তর সাগরের দিকে। কিন্তু সে দেশের লোকদের কাছে তো ফিন্‌ল্যাণ্ড দূর নয়, একেবারে সেখানেই। আর কত আপন, কত চিরদিনের রূপকথা, প্রাচীন কারেলিয়ার উপাখ্যানে যুদ্ধের কাহিনীতে ভরা। আমরা যখন ফিন্‌ল্যাণ্ডে উপস্থিত হই, তখন আর মনে হয় না, চলো যাই— মনে হয় এই তো এসেছি।

কোনো দূর দেশের খুব কাছে যাওয়ার ভালো একটা উপায় আছে। কী বলো তো? সেটা হচ্ছে সেই দেশের মর্মকথায় ভরা কোনো ভালো বই পড়া। তোমরা জানো কি ফিন্‌ল্যাণ্ডের সবচেয়ে

বড়ো গল্প লেখক সিলান্‌পা কয়েক বছর আগে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ? তাঁর লেখা—'ফল্‌ন্‌ অ্যাস্লিপ্‌ হোয়াইল্‌ ইয়াং'—গল্পটা পড়লে দেশের মাধুর্য, বেদনা আর বীরত্বের ছবি তোমরা মনে মনে দেখতে পাবে। এক গ্রাম্য মেয়ের জীবন এই কাহিনীতে আছে। কত তার একাকী দুঃখের জীবন, কিন্তু তবু বিষণ্ণতা নেই। কারণ মেয়েটির মনে প্রাণে একটি মহত্ব মিশিয়ে আছে। তার জীবন-পথের ধারে ধারে কত ঘনতরুচ্ছায়া, কত হ্রদের তীরবর্তী শান্ত পল্লী। শীতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলো দেখা যায় অন্ধকারে, তারই দিকে চেয়ে আছে।

ম্যাপে ফিন্‌ল্যাণ্ড আবার দেখে নিলে বেশ লাগবে—ঐ দেখো, উত্তর য়ুরোপের এক কোণে সুয়োমি দেশ। ওখানে গেলেই মন চলে যায় রাশিয়ার দিকে, আর এস্‌কিমোদের দেখে আসতেও মন কেমন করে।



আফগানিস্থানে

বড্ড গরম পড়েছে।

চলো তবে আফগান মুল্লুক—যেখান থেকে আসে ঠাণ্ডা দেশের আঙুর, মেওয়া আর জোয়ান দীর্ঘকায় মানুষ। হোক না তারা দুর্ধর্ষ কাবুলিঅলা। হিন্দুকুশের হাওয়া লাগবে গায়ে, রুক্ষ আর শ্যামলে মেলানো পাহাড়ি বাগানে বাগিচায় দেখবে বাদামের শাদা ফুল আর রঙিন চেরি আপেল মঞ্জরীর বাহার। কাবুল নদীর ধারে ধারে উঁচু নীচু উপত্যকার শব্‌জি শস্যক্ষেত, ফলের কুঞ্জ, শহরের রাস্তায় যেতে চোখে পড়ে কোহ্-ই-বাবা শৈলমালার উপরে ঝলমলে তুষার মুকুট। চতুর্দিকে ঠাণ্ডা সোনালি স্তব্ধতা ; পায়ের কাছে ছায়া ফেলে পপ্‌লার গাছের সারি দাড়িয়ে আছে। তীক্ষ্ণ নীল আকাশ। সত্যি বলছি—আজ কবির কথায় বলতে ইচ্ছে করছে না—"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন।" অত গরম সইবে কে ? যদিও আমরা একবার ভরা গ্রীষ্মকালেই বোগদাদী মরুর গরম ভোগ করেছিলাম কবির সঙ্গে। "খাইবার পাস পেরিয়ে চলো—নাচব তা ধিন্ ধিন্—" আমার মনের অবস্থাটা এই রকম। যদিও "নাচব তা

ধিন্ ধিন্” যোগ করা হলো মিলের জন্যে, তবুও কথাটা জরুরী। তা ছাড়া, ঠাণ্ডা দেশে এলে কার না নাচতে ইচ্ছে করে। কলকাতার কত লোক দার্জিলিঙে গিয়ে নাচানাচি করেন। চলো আমরা কাবুলে যাই—লাহোর, পেশাওয়ার পেরিয়ে, গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে। পথ অবশেষে নিম্‌লা জেলালাবাদ থেকে হঠাৎ হিমঝরানো পাহাড়ে উঠে যাবে। তখন যথার্থই মনে হবে চিরবাসন্তী-স্বর্গে এসেছি। মোটরের চাকার তলায় নরম বরফ আট্‌কে যাচ্ছে, চোখ মেলে দেখি রাত্রির তারাগুলো উত্তুঙ্গ শৈলপথের জমাট হিমে রূপোলি ছড়িয়ে দিয়েছে। অথচ তখনও অন্যত্র গ্রীষ্মকাল। কিন্তু মনে রেখো—নিম্‌লার তরুমর্মরিত সুন্দর অতিথি ভবনে এসে তবেই প্রথম শীতের আমেজ পাওয়া যায়। পেশাওয়ার ও কাবুলের মধ্য-পথে তন্বী এই জনপদটি মোগলদের তৈরী; এখনও ভারতী-আফগানি যাত্রী এখানে খানিক বিশ্রাম করে নেয়। রাত্রিবাসেরও খুব ভালো ব্যবস্থা আছে। সাবধান করে দিচ্ছি সেখানে পৌঁছবার আগে কিন্তু যথেষ্ট গ্রীষ্ম পথের দুঃখ ভোগ মেনে নিতে হয়। পথটা নির্লিপ্ত, উদাসীন খাইবার-পাস্ নাম শুনে ভুলতে নেই—সেখানে খাইবার-কিছু-না-পাস। সব সঙ্গে আনতে হয়। তবে সুদৃশ্য দেখে সুখাদ্যের কাজ যদি কারো হয় তাদের কথা আলাদা। আগাগোড়া পথটা চমকে ভরা। খাড়াই, খাদ, ঘন গাছে ঢাকা পাহাড়, মুণ্ডিত মাথা, রুক্ষ পাহাড়, ঝর্ণা, তাম্রবরণ পাথর, দুর্গ দ্বার, কোথাও যাযাবরদের কালো তাঁবু—এই রকম ছবির বর্ণমালা। ঐ যে নিশ্চল হয়ে সীমান্তের সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও আবার বন্দুকধারী স্বাধীন শৈলবাসী সন্তর্পণে চলে গেল। উটের ক্যারাভান ঘণ্টা বাজিয়ে কোথায় যাচ্ছে। আবার মাইলের পর মাইল কোথাও কেউ নেই। লোকালয়ের কাছে এসে দেখা যায়—হেনারঞ্জিত দাড়িওলা গজ্‌নির

লোক, হেরাটের বণিক, আমুদরিয়ার ধার থেকে আসা গ্রীক-তুর্কী তাতার-ভারতীয় নানা বর্ণসঙ্কর মানুষ। আফগানিস্থানের উত্তরাঞ্চলে মজার-ই-সরিফ, সেই দিকে যাবার সময়ে এবং কান্দাহার, চমন্ দিয়ে ফেরবার পথে, য়ুরোপ-এসিয়ায় মিশ্রিত নানা জাতীয় লোক দেখছি। মেয়েদের নীল চোখ, শুভ্র মূর্তি অথচ ভারতীয় ধরণ। বেশ-ভূষাতেও হিন্দু-গ্রীক যুগ্ম ভাব স্পষ্ট চোখে পড়ে। পেশাওয়ার-কাবুলের পথটি ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে চলে এসেছে। ভেবে দেখো, কত যুগের কত অভিযানের কাহিনী তার ধূলোয় মিলিয়ে গেছে। আফগানিস্থানের রাস্তা আজ আবার লোকের মনে জাগ্রত হয়ে উঠেছে—কেন না সুভাষচন্দ্র ঐ পথে চলে গেছেন।

আফগানিস্থানের সঙ্গে নূতন-পুরাতন বিষয় রোমান্সের মতো জড়ানো। ধারেই দেখো সোভিয়েট রাজ্য। অক্সাস বা আমুদরিয়া পেরিয়ে মন ছুটে যায় তাসখন্দ্-সমরখন্দ-বুখারার দিকে। যেখানে নূতন যুগারম্ভ। মধ্য এসিয়ার দরজাটা হঠাৎ যেন খুলে যায়। সে আরেক অপূর্ণ চেতনা। ভাবা শক্ত, একদিন লাহোরের লোক কাবুল-কান্দাহারকে, বিহার-বাংলার মতনই কাছে মনে করত। হিন্দুকুশের পার্শ্ববর্তী কত রাজ্য ছিলো ভারতবর্ষের অন্তর্গত। মোটরে চড়ে ঐ দিকে আজ আরো কত যাওয়া যায়। কিন্তু নানা কারণে এখনো ভারতের কাছ থেকে মধ্য-এসিয়া দূরে সরে আছে। প্রতি-বেশীর সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ কীভাবে যে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার বিষয়ে জওহরলাল লিখেছেন তাঁর গ্রন্থে—"ডিস্কভারি অফ্ ইণ্ডিয়া"য়।

আফগানিস্থান আমাদের মনকে টানে বিচিত্র পুণ্য সংসর্গে। ঐ অঞ্চলকে বেদভূমি বলা চলে তোমরা জানো, ভারত-পথযাত্রী আর্যরা এসেছিলেন হিন্দুকুশের মহিমচ্ছায়াময় এই দেশে।

চলো যাই

বেদগ্রন্থে গোমেল্ এবং অন্যান্য গিরি-সঙ্কটের উল্লেখ আছে।—ভূগোল মিলিয়ে নেওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধযুগেও ভারতীয় সভ্যতার একটি কেন্দ্র ছিলো এই দেশে—যাকে এখন বলা হয়, আফগান রাজ্য। বহু গ্রামে নগরে আজও বৌদ্ধ চিহ্ন অক্ষয় হয়ে শোভা পাচ্ছে, বিশেষ করে বামিয়ানে। কাবুল থেকে তিন শত মাইল পাহাড় পথ ভেঙে কত কষ্টে আজ আমরা মোটরে যাই বামিয়ান পল্লীতে; সেখানে গিয়ে ভাবছিলাম, সুদূর অতীতে প্রাচীন শিল্পীরা কোন্ অন্তরশক্তি বলে এই দুর্গম তীর্থে এসেছিলেন। তাঁদের ধ্যানমন্ত্র আজো গিরিগাত্রে জেগে আছে—পাথরে খোদাই করা বিরাট বুদ্ধমূর্তি। বামিয়ান ছিলো চীন দেশ থেকে কাস্পিয়ান সাগরে যাবার মধ্যপথ। পশম ব্যবসায়ীরা হিন্দুকুশের প্রান্তবর্তী এই দরজাটিকে ছুঁয়ে যেতেন। এ যেন উত্তর ভারতীয় প্রান্তদ্বার। ভগবান বুদ্ধের অভয়বাণী যুগে যুগে কত যাত্রীই ঐখানে এসে শুনে গেছেন।

বামিয়ান অপূর্ব সুদৃশ্য শৈলপল্লী, সামনে হিমগিরি। নীচু উপত্যকায় ছোটো নদী বয়ে যাচ্ছে। সর্বক্ষণ শির্‌শিরে ঠাণ্ডা হাওয়া। চলো ওখানে ছুটি কাটিয়ে আসি।

পুনশ্চ ঃ—

কয়েকটা কথা বলতে ভুলেছি ঃ

১। কাবুলের সবাই কাবুলিঅলা নয়—অর্থ বুঝে নাও।

২। আফগানিস্থান জর্মানির চেয়ে দেড় গুণ বড়ো; জাপানের প্রায় সমান। কিন্তু আজ পর্যন্ত কাজে লাগানো গেছে দেশের $\frac{1}{8}$ অংশ। বাকি শুধু বুনো পাহাড়, অরণ্য, খরামাটি ইত্যাদি।

৩। কাবুল, কান্দাহার, গুলবাহার, ইস্‌কিলিম, বদখ্‌সান্—এই সব নাম শুনলে কি আফগানিস্থানে যেতে ইচ্ছে করে না? কাওসান

বল্‌খ্, আসমান ঝুরুম—এই বা মন্দ কি? 'খোস্ত' নামটা শুনে 'দোস্ত্'কে মনে হয় না কী?

৪। গুচ্ছ গুচ্ছ কালো আঙুর আর শুকনো ঠাণ্ডা পরিষ্কার কিসমিস একই সময়ে খেতে চাও তো কান্দাহারে যাও। ইস্তালিফের আপেল আর গোলাপ—অমন আর কোথাও নেই। চরিখর শহরের চা।

৫। কাবুল আসলে কাবল্। কারখানাকে ওরা বলে মেশিন-খানা। ভাষা ওদের প্রধানত পস্তু। শুকনো দই খায় তার নাম কারুৎ। কারাকুলি ভেড়ার জন্যে প্রসিদ্ধ। টাকাকে বলে টঙ্গা। টংকাও নয়—কী অন্যায়।

৬। হিন্দুকুশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তিরিচ্‌মির উঠেছে ২৫,৪২৬ ফিট পর্যন্ত। কিন্তু আফগানিস্থানে নয়, চিত্রালে। আফগানী হিন্দুকুশের উচ্চতম শৃঙ্গ শা ফাউলাদী উঠেছে ১৬,৪৭০ ফিট পর্যন্ত। হিন্দুকুশের বর্তমান আফগানী নাম কোহ্-ই-বাবা। হরি-রূদ আরেকটি আফগানী শৈলমালার নাম। নদীর নাম—হেলমন্দ্ (শাখার নাম আর্ঘেশান, তানাক্, আর্গান্ধাব্)। বেশ তো শুনতে। আরো নদী: ফরারূদ, খাস্‌রূদ, হরিরূদ, মুর্ঘাব। আরো নাম: পঞ্জশির, আকৃশু। আর নামে কাজ নেই। আমুদরিয়ার কথা নাই বললাম।

৭। কেউ যদি বলে কাবুল উপত্যকা কাশ্মীরের চেয়ে কম সুন্দর তাহলে শুনোনা। আরো ছোটো আবেষ্টনীর মধ্যে বরফি পাহাড়, আঙুর বন, ফল-ফুল-বাগান, গাছের সারি (চেনার, উইলো, পপ্‌লার) সবই আছে। ঠাণ্ডা সারা বছর। শীতের সময়ে খুব বরফ পড়ে, পুরু শাদা হয়ে বাড়ির ছাদে, রাস্তায় পড়ে থাকে। রোদ্দুরের আলোয় আশ্চর্য দেখায়। ছোটো ছেলে-মেয়ে বয়স্ক সবারই তখন গাল লাল, আর শরীর আরো সুস্থ। এই কাবুল শ্রেষ্ঠ বাগান-বিলাসী

সম্রাট বাবরের চোখে সব চেয়ে সুন্দর মনে হতো। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ একটি বাগান তাঁরই সৃষ্টি। কিন্তু দেখো, আগ্রায় মৃত্যুকালে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—কাবুলে যেন তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। কাবুল শহর উঁচু নীচু। সবচেয়ে উঁচু অংশ ৬,৫০০ ফিট।

৮। আমানুল্লা, নাদির-শা এবং সম্রাট জহীর-শা'র বিষয়ে প'ড়ো। বাচ্চা-ই-সাকোর কী কাণ্ড জানো কী? কী অদ্ভুত সব ঘটনা! আধুনিক আফগানিস্থান দ্রুত এগিয়ে চলেছে। উদ্যোগী এসিয়ার সঙ্গে মিলতে ব্যস্ত।

আরো নাম—বারোঘিল, দোরা, আঞ্জুমান, পারান্‌দি, গোমল, কোরাম। বড়ো বড়ো গিরিসঙ্কটের নাম। ভারতবর্ষে আসবার রাস্তা। ফিরে এসে দেখি এখনও এদেশে গরম। গরম মানে কলকাতা।



ন্যু ইয়র্কে

সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে পৃথিবীর শেষে এ কোথায় এসেছি—সামনে ঐ যে সব ৬০।৭০ তলা বাড়ির দৈত্যপুরী, ঐ কি আমেরিকা? অর্থাৎ ন্যু ইয়র্ক? মনে হয়, ব্রব্‌ডিঙনাগের ছেলেরা খেলবার ব্লক সাজিয়ে একটা আজগুবি শহর বানিয়েছে। আর আমরা লিলিপুট দেশের মানুষ সামান্য সাত তলা জর্মান জাহাজ থেকে ঐ সব দেখছি। ভোরবেলায় আমাদের ব্রেমেন নামক ভাসমান শহরটা লিবার্টি আইল্যাণ্ডের কাছে এসে থামলো। সেই ছোট্ট দ্বীপটায় স্বাধীনতার প্রতীক নারীমূর্তি আকাশে মাথা তুলে মার্কিন যুক্তরাজ্যের বিরাট শক্তির কথা ঘোষণা করছে। তখনো দূর তীরের ন্যু ইয়র্ক শত কোটি ম্লান বিদ্যুতালোকে অবিশ্বাস্য ইন্দ্রলোক সাজিয়ে বসে আছে, —নীল ঢেউ, ভোরের রাঙা আলো আর দীপের দূর আভা দুলছে। যাই বলো চমকে উঠতে হয়। মানুষের কতখানি শক্তি পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে ঐ প্রচণ্ড শহর তৈরী করলো—য়ুরোপ থেকে বাহুবল এবং মনের বিপুল ইচ্ছা কখন হঠাৎ আমাদেরই মতো ভাসতে ভাসতে

অজানা দেশে এমন একটা সভ্যতার ভিৎ বাঁধলো। প্রথমটা মন অভিভূত হয়েছিলো, পরে যখন শহরে নেমে উত্তুঙ্গ গৃহ-শৈলমালার ফাঁক দিয়ে রাস্তায় ঘুরেছি তখন ক্রমে স্থাপত্যের স্বতন্ত্র পাহাড়গুলো ছন্দে ছন্দে ফুটে উঠলো—দেখলাম শুধু উর্ধ্বতা নয়, ন্যু ইয়র্কের এক আশ্চর্য সুন্দর শ্রী আছে। এই শহরে বরাবর থাকতে চাইনা কিন্তু হঠাৎ এসে দেখতে চাই। ১৯৩০ সালে তখনো পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং তার ১০২ তলা নিয়ে ন্যু ইয়র্কের অভ্রভেদ করে ওঠেনি, যা ছিলো তাও উঁচু নেহাৎ কম নয়। উলওয়ার্থ—৫৫ তলা, রকফেলার সেণ্টারের একটা অফিস —৬৯ তলা, ক্রাইজ্‌লার বিল্ডিং—৭৭ তলা; শেষের বাড়িটাই তখনকার গৌরীশঙ্কর—হায়রে, হিমাভ্র ধ্যানের শান্তি কোথায়? তারই উপরে উঠেছিলাম। উঠেছিলাম বলতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নয়, বলাই বাহুল্য। ১০।২০টা এক্সপ্রেস লিফ্‌ট্‌ প্যাসেঞ্জার লিফ্‌ট্‌, উঠছে নামছে—তারই একটায় দুই চরণ শরণাপন্ন হয়েছিলো। তোমরা জানো এসব 'কপিকল' (নামটা সাধারণ লোকে ঠিকই দিয়েছে)। আমাদের কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ তলার মেয়াদ নিয়ে খাড়াই ওঠে না; ৭৭ তলার বহু সহস্র অফিসবাসীদের জন্য চলন্ত বাক্সগুলোর কোনোটা কেবলমাত্র ১০এর কোঠা ছুঁয়ে যায়, কোনোটা লোকাল্‌ ট্রেনের মতো সব জায়গায় থামে। হিসেব ক'রে উঠো। নয়তো আবার নেমে এসে প্যাসেঞ্জার গাড়ি ধরতে হবে। খাঁচাগুলোতে ব্যবস্থা খুবই আরামের, কিন্তু তবু যদি চূড়ায় উঠে ক্লান্তি বোধ হয়? বেশ তো, ঐ যে সাজানো রয়েছে হরেক রকমের আইসক্রীম—চকোলেট। ছবির ম্যাগাজিন পড়ো, ছোট্ট রেস্তরাঁয় জিরিয়ে নিয়ে ক্ষুদে দূরবীন ভাড়া ক'রে চারিদিকে চেয়ে দেখো। এই সব আয়োজন ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের মন

অত্যধিক আরামেই বেশী হাঁপিয়ে ওঠে—সবটাই বাড়াবাড়ি। বাড়ির বাড়াবাড়ি, আয়োজনেরও। মানুষকে কি আপন স্বভাবমতো মাটির কাছাকাছি একটু স্বচ্ছন্দে থাকতে দেবেনা, এরা দেখেছি কোনো কোনো সৌখীন আধুনিক ধর্মগৃহের ভিতরেও খাবারের দোকান রাখে। বেশী প্রার্থনা ক'রে বা না ক'রে ক্লান্ত তৃষিত হ'লে তার ব্যবস্থা হাতের কাছেই। আমাদের দেশে যেমন অনেক স্থলে কষ্ট করাটাকেই অত্যন্ত দাম দেওয়া হয়, তীর্থযাত্রীর পক্ষে দড়ির ব্রিজ ছিঁড়ে খাদে পড়লেও সাক্ষাৎ স্বর্গলাভ, তেমনি এরা উল্‌টো পথে মুক্তি খুঁজছে। সে যাই হোক, ভয়ে ভয়ে রেলিঙের বাইরে মাথা বাঁকিয়ে ৭৭ তলার লম্বা মানুষের দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখে নিলাম। নিচে পিঁপড়ের মতো মানুষের সারি, জোঁকের মতো ট্রাম, কেন্নোর মতো রেলোয়ে ট্রেন—আর ওটা কি? সত্যিই, দেখেও বিশ্বাস হলো না! ঐ নিচে আরেকটা বাড়ির ৫২ কি ৬২ তলার কার্নিসের কাছে পা ঝুলিয়ে মার্কিন রাজমিস্ত্রী কাজ করছে—নিচে শূন্য, উপরে শূন্য, লোকটা অথচ অনায়াসে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় চুরোট ধরিয়ে স্বর্গ মর্ত্য নিরীক্ষণ করছে। যাক, আর দেখে কাজ নেই। একটু মাথা ঘুরছিলো। ধন্য ন্যু ইয়র্ক, ধন্য মার্কিন মানুষ—এই ব'লে নেমে পড়লাম।

কিন্তু ক্রাইজ্‌লার বিল্ডিং দেখতে সুন্দর। সোনালিতে-শাদায় তার সুঠাম ছন্দ দূর থেকে কী রকম আলোক-মনোহর বোধ হয়। সব মিলে একটি পরিচ্ছন্ন সমাবেশ আছে, যা অর্কেষ্ট্রার মতো শত যন্ত্রের ঐকতানে বেজে ওঠে। আমেরিকার সর্বত্র এই একটা দরাজ ভাব আছে—যা শুধু আয়তনে বৃহৎ নয়, সৃষ্টির দিক থেকেও বড়ো। এদের বাড়িতে, শহরে, মানুষের ব্যবহারে বিপুলের সঙ্গে নিপুণের যোগও দেখা যায়; মস্ত একটা ভূখণ্ডের অধিবাসী এরা যেন সবটাতেই জোর গলায় কথা বলছে, কিন্তু ভাবটা খোলাখুলি। তবে

অত জোরেও দুর্বলতা। ভাবছো কি অ্যাটম্ বম্ জিনিসটা সভ্যতাকে শক্তিমান করবে? মোটেই নয়। সব দেশ সম্বন্ধেই এ কথা খাটে।

চলো যাই ন্যু ইয়র্কে। রাস্তার শব্দে কানে তালা ধরবে, চলন্ত আলোয়, জিনিসের ভিড়ে চোখ টাটাবে। ধাক্কায় আর ঝাঁকানিতে শরীরটা টল্‌টল্ করবে। কিন্তু মানুষের কী না সয়। যাকে ওরা বলে টেম্পো, অর্থাৎ জীবন-যাপনের ছন্দ, তা অসম্ভব দ্বিগুণ চৌদুনে চললেও একরকম ক'রে আয়ত্ত হয়ে যায়। হঠাৎ কখনো রবীন্দ্রনাথের পার্ক্ অ্যাভিনিয়ুর ফ্ল্যাটে অগাধ শান্তির স্পর্শ আবার ফিরে পেতাম। দেখতাম তাঁর সামান্য কয়েকতলা বাড়ির ছাতের উপর ফুলে ফুলন্ত নিভৃত নিকুঞ্জ, উপরে নির্জন নীলিমা, দূরে মেঘ, হঠাৎ সমস্ত ন্যু ইয়র্ককে অত্যন্ত ছোটো ব'লে মনে হতো। বন্ধু এলমহার্ষ্টের এই ফ্ল্যাটে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। ঐখানে ব'সে বাংলা কবিতা লিখেছিলেন—"সূর্য যখন উড়ালো কেতন"। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে প'ড়ে দেখো। আরেকটা ঘটনার কথা বলি। ব্যস্ত-সমস্ত মানুষ ব্যবসায়ীর আক্রমণ থেকে পালাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐ ফ্ল্যাটে আইন্‌স্টাইন্ এসে একবার সারাদিন কাটিয়েছিলেন। তাঁর জাহাজ তীরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই বেতারযোগে অগণ্য অনুরোধ আইন্‌স্টাইন্‌কে ঘিরে ধরেছিলো—দাও বক্তৃতা, বলো—আমাদের মার্কা কলম বা কালি বা টুথপেস্ট্ তুমি ব্যবহার করো, দেবো এতো হাজার ডলার ইত্যাদি। অবাক আইন্‌স্টাইন্ ঠিক করলেন এই অদ্ভুত শহরে এবারে নামবেন না। তারপর ছোট্ট স্টীমলঞ্চ্ ক'রে জাহাজ থেকে পালিয়ে এলেন। আমরা দেখি, ঘরে দুই শুভ্রকেশ মহাপুরুষ, নিরালায় গল্প করছেন। কত সহজ তাঁদের উচ্চতা। ষাটতলা বাড়ির চেয়ে উঁচু। অথচ বিনম্র, শান্ত কর্মী এঁরা। মনে রাখতে হবে ন্যু ইয়র্কের প্রলাপী বিরাটত্বের কেন্দ্রেও বহু ধ্যানী মনীষী আছেন, কিন্তু তাঁদের অনেকটা লুকিয়ে

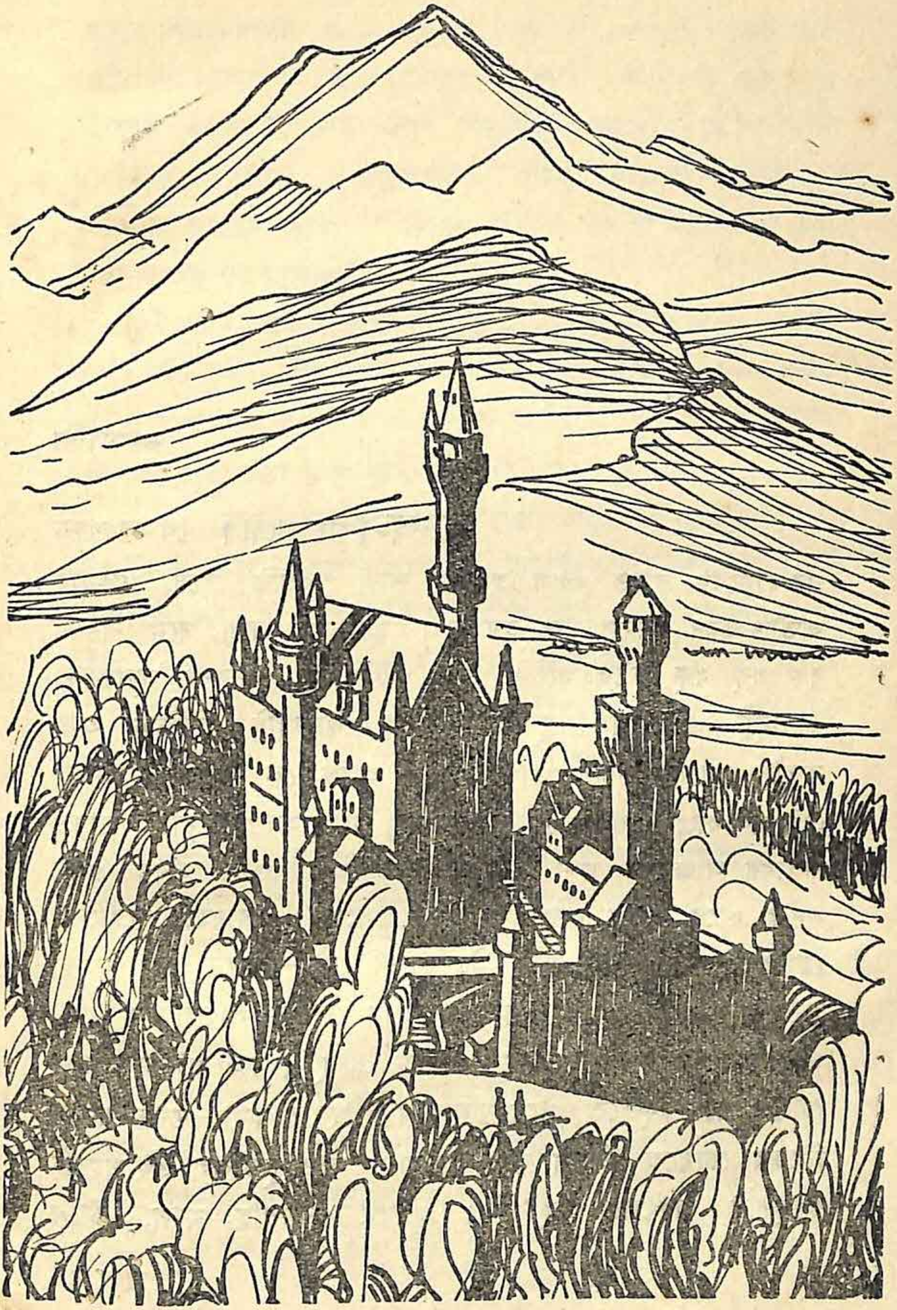
থাকতে হয়। তাছাড়া কাছেই পালাবার জায়গা আছে। ন্যু ইয়র্ক সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য কথা এই যে, ঐ প্রচণ্ড ঘূর্ণি শহর—যার মনে হয় শেষ নেই, পার নেই—তারই মাত্র কয়েক মাইল এদিকে ওদিকে শ্যামল পল্লী ছড়ানো। সেখানে চিরকালের পাখি ডাকে, হেমন্তের রাঙা পাতা সেখানে ঝরা মাধুরীর স্বর্গ বিছিয়ে দেয়। কোথাও বা নীল জলের কাছে ধব্‌ধবে বালি। ছেলেমেয়েরা খেলবে।

ন্যু ইয়র্কের বাসিন্দা বহু বিখ্যাত লোক—যেমন, থিয়োডোর ড্রাইসর, সিনক্লেয়ার লুইস্, এঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে এলেন। জগৎ প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় সাঙ্গীতিক ক্রাইজ্‌লার ছিলেন আমাদের সঙ্গে এক জাহাজের যাত্রী। তাঁর সঙ্গে কবির খুব জমেছিলো। আর ছিলেন পিয়ানিস্ট্ গীস্‌কিং। একথা বলতেই হবে, মার্কিনীরা যথার্থ ভালোর সম্মান দিতে জানে। ন্যু ইয়র্কের শ্রেষ্ঠত্ব তার বহু জনতার বিনত শ্রদ্ধায় প্রকাশ পায়—এটা আমাদের জানা। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের আচরণে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম—এ তো শুধু সম্মান নয়, এর মধ্যে একটি স্বীকৃতি আছে।

এই তো তিনটি দ্বীপকে নিয়ে একক, দশ মাইল বারো মাইল লম্বা রাস্তাঅলা ন্যু ইয়র্ক। উপরে ট্রাম, ট্রেন, দোতলা তিনতলা জানলার পাশ দিয়ে ছোটো এলিভেটেড ট্রেন, মাটির নিচের পাতালে বিদ্যুৎ—ছুটন্ত রেলগাড়ি। আকাশে গুঞ্জন ক'রে চলেছে রূপোলি এরোপ্লেন। মধ্যে একবার হাডসন্ নদীর ধারে আমরা ছিলাম—এক মাইল চওড়া প্রবল উত্তাল জলধারা। মহাসমুদ্রের দিকে মন ছুটে যেত। কিন্তু মার্কিন দেশ সহজে মনকে ভুলতে দেয় না—হঠাৎ চমকে উঠে ভাবতাম, ঐ প্রচণ্ড নদীর তলা দিয়ে ট্রেনগুলো হুস্ হাস্ করে ছুটেছে, এ আবার কী কাণ্ড! ন্যু ইয়র্কে গিয়ে গরমের সময়ে কৃত্রিম তুষারে খেলা করো, ঠাণ্ডায় জমানো ঘর আছে

তাতে বরফের মাঠে দৌড়ানো যায়। গোল আতস কাঁচ ঢাকা টেবিলে দেখো কীটতম কীট। সাধারণ চোখের অদৃশ্য কীটকে শিশুদের পোশাক পরিয়ে নাচানো হচ্ছে ; ব্রড্ওয়ে রাস্তায় রাত দুপুরে গিয়ে আলোর চলন্ত হরফে লেখা যত রাজ্যের গল্প, সংবাদ পত্রের খবর পড়ো, অগণ্য রঙিন আলোয় আঁকা চলচ্ছবি দেখো। হোটেলে ঢুকে প্রায় সারা পৃথিবীর খাদ্য পানীয়ের ভিড় দেখো, কলকব্জায় আশ্চর্য হও, কলের সাহায্যে গান শোনো, স্নান করো। দেশান্তরের সঙ্গে কথা কও। কলের কৌশলে মুগ্ধ না-হয়ে দু-চারটে কলিযুগের আশ্চর্য বিদ্যা শিখে নাও—ন্যু ইয়র্কে জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আয়োজন আছে, যার কিছু আয়ত্ত করতে পারলে ভারতবর্ষের কাজে লাগবে। কিন্তু শীঘ্র দেশে ফিরে এসো। যন্ত্ররাজের কাছে শিক্ষা করো— দীক্ষা নিয়োনা। কেননা যন্ত্রের চেয়ে বাহু বড়ো, বাহুর চেয়ে মানুষ বড়ো, মানুষের মনুষ্যত্বের আরো বড়োর সন্ধান আছে। প্রশান্ত সমুদ্রের দ্বীপের কাছে বা মেরুর কাছে যারা আণবিক বোমা নিয়ে সাংঘাতিক খেলা খেলছে তাদের দেশ বা অন্য যে-কোনো দেশ মারণ-মন্ত্র জপে যতই শক্তি দেখাক্, তাদের উত্তর আছে কবির কথায়। ভারতীয় প্রাণ-মন্ত্রে। "মেশিনগানের সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান"।

এই প্রাণ-মন্ত্র মার্কিনেও আছে ; সেখানকার সহজ সহৃদয় মানুষের কাছে তাদেরই ভাষায় এবং আদর্শে এই কথা শুনেছি।





জর্মানি

কোথায় যাবো ? যে সব শহর নর-দানবের হাতে ধ্বংস হয়েছে তার পূর্বস্মৃতি বেয়ে, একবার অতীত ভ্রমণ করলে মন্দ হয় না। য়ুরোপের কথা মনে করলে বুক ধক্ ধক্ ক'রে ওঠে। ভাবি রটারডাম্, ওয়ার্-শ, বুদাপেস্ত, কভেন্ট্রি—এই সব সুন্দর শহরের কতখানি নিশ্চিহ্ন আর কতটুকু আজো সুন্দর জাগন্ত হয়ে আছে কে জানে। আবার এই সব ধ্বংসের জন্যে যে দেশের রাষ্ট্র হলো সবচেয়ে দায়ী তারও শহরের আজ কী দশা। মনে পড়ে যায় প্রবল সুন্দর এল্‌ব নদীর ধারে ছবির মতো জনপদ—ড্রেসডেন। বোধহয় য়ুরোপের ফ্লোরেন্স বাদে এমন সুশ্রী চিত্র-ভাস্কর্য সৌধ-বাগানে ভরা নগরী আর যেন নেই। সেই ড্রেসডেন যখন দেখতে পাওয়া যায় উড়ন্ত জাহাজের উপর থেকে—মনে পড়ছে প্রাগ্ থেকে অগণন অরণ্য প্রান্তর বেয়ে ঝক্‌ঝকে দুপুরে ড্রেসডেনে পৌঁছবার কথা—তখন সত্যই নিজের চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। সহস্র চূড়াঅলা এই শহরটি স্যাক্‌সনি অঞ্চলের মুকুটমণি। এইখানে রূপোর কাজ, চীনে

মাটির শিল্প—বাসন কোসন কিনতে দেশ বিদেশের লোক ভিড় করে। তাছাড়া য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্রালয়ের একটি কেন্দ্র এই ড্রেসডেনে। ভাবতে ভয় করে সেই অপূর্ব শিল্প-সদন আজো আছে কি নেই—সেইখানে দেখেছি রাফায়েলের "সিষ্টিন্ মাদোন্না"—সেই মা জননীর অপরূপ ছবি। তাছাড়া "পবিত্র রজনী" নামে আর একটি বিশ্ব বিশ্রুত শান্তোজ্জ্বল চিত্র।

এই শহর থেকে চলো যাই এল্‌ব নদীর ধার দিয়ে দিয়ে অভিযানী মোটরের পথে। দূর নীলিম অরণ্যে এসে গিরিবর্ত্ম শেষ হলো। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯৩০ সালে সেখানে গিয়েছিলাম। সহস্র উজ্জ্বল প্রাণবন্ত জর্মান তরুণদের আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন নি। জায়গাটির নাম হোহেনষ্টাটন্। প্রসন্ন সবুজ-ঘন-সমুদ্র আরণ্যক উপনিবেশের মধ্যে চললাম আমরা। কলেজ-স্কুলের তরুণ তরুণী নানা প্রদেশীয় জর্মান অগ্রদূতেরা নিজের হাতে গাছ কেটে, সুন্দর একটি কুটীর কবির জন্যে বানিয়ে রেখেছিলো। সদ্য সুরভি পাইনের হাওয়া ঘরে দোরে মাখানো ছিলো; মেঝের পাথর ছেলে মেয়েরা ঘষে ঘষে মসৃণ করে দিয়েছে, তারই উপর বিরল আসবাব—একটি খাট, দুটি চেয়ার, একটি টেবিল সবই পাইন কাঠে নতুন তৈরী। গৃহসজ্জার মধ্যে পাতাভরা নানারকম গাছের ডাল, জানলায়-দরজায় সুচারু ছন্দে বসানো হয়েছে। বাইরে যে দিকেই চাওয়া যায়—ঘন নীল আকাশখণ্ড নেমে এসেছে শ্যামল মর্মরিত, সবুজ স্তম্ভিত বনানীতে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে শরীর মনের নির্মল স্বাস্থ্য ছেলে মেয়েদের মুখে দীপ্যমান; তাদের ঝর্ণার মতো হাসি, তাদের হঠাৎ গাওয়া গান, তাদের কর্মঠ সুশ্রী চলার ভঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে তাদের দেখছিলেন। দু-দিনের আতিথ্যে তারাই নিজের হাতে রান্না ক'রে বাসন ধুয়ে, অভিনয় গীতায়োজন ক'রে, দূর হিন্দুস্থানের

মহাকবিকে তৃপ্ত করেছিলো। গভীর প্রশ্ন তারা নিয়ে আসতো কাগজের টুকরোয় লিখে—জন্ম-মৃত্যু, লোকায়ত বিচিত্র উৎকর্ষ ধারার বিষয়ে সূক্ষ্ম প্রশ্ন। জ্ঞানময় বিজ্ঞানময় উৎসুক জিজ্ঞাসা। অবসরক্ষণে রবীন্দ্রনাথ যেটুকু বলতেন কত নিবিষ্ট হয়ে শুনতো তারা। তারপর আবার গাছ কাটতো, মাটি খুঁড়তো, রাস্তা বানাতো সেই অজস্র উৎসাহী যৌবনিক দল। বার বার রবীন্দ্রনাথ বলতেন, এইতো এরা প্রাণের রাজা। বিত্ত নেই এদের, মান এদের ত্যাজ্য, কিন্তু প্রাণের সন্ধানে এরা বিভূষিত।

চলো যাই সেই এল্‌ম্‌-পাইন্‌-বার্চ্‌ বৃক্ষলোকের সহজাত মন্দিরে। ডালে ডালে যে-মন্দিরের তোরণ তুলেছে মাটির আদিম তরুদল। যেখানে ধ্বনিত হচ্ছে পাখির গান, মানুষের কণ্ঠস্বর আর সহস্র কোটি পত্রের উদার নিস্বন। মনে হয় আজো সেই নবীন অগ্রণীরা সন্ধ্যায় এখানে ওখানে পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাতার আগুন জ্বালিয়েছে। রাঙা সোনালি "বন কায়ায়" এই অগ্নি-মালিকা। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠেছে শত কণ্ঠের ঐকতান—আশ্চর্য সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের জন্যে ছেলে-মেয়েরা তাদের অবসর কর্মকেন্দ্রে এমনি ক'রে চিরাচরিত জর্মান প্রথায় বন্দনা জানিয়েছিলো। কোথায় গেল হাস্যোজ্জ্বল তরুণ মুখ, সেই নীল চোখ, সেই প্রাণভরা সহজ সম্প্রদায়। তাদেরও কি একদিন কালোছায়া দিয়ে ঢাকলো নাৎসীদের এবং সমগ্র পৃথিবী জোড়া আঁধির হাওয়া—নিশ্বাস কি তাদের বন্ধ হলো, চোখে মনের আলো গেল নিভে। কেমন যেন বিশ্বাস হয় না। অত বড়ো মহাদেশে নিশ্চয়ই সবুজ অরণ্য, মনের তারুণ্য আজও শতচূর্ণ শোকার্ত ড্রেসডেন নগরীর প্রান্তে নানা কেন্দ্রে জেগে আছে। যখন রবীন্দ্রনাথের গাড়ি পাহাড়তলির দিকে নেমে এলো, দু-দিনের চিরবন্ধুদলের কত চোখে অশ্রু দেখা দিলো। কিছুই চায়নি

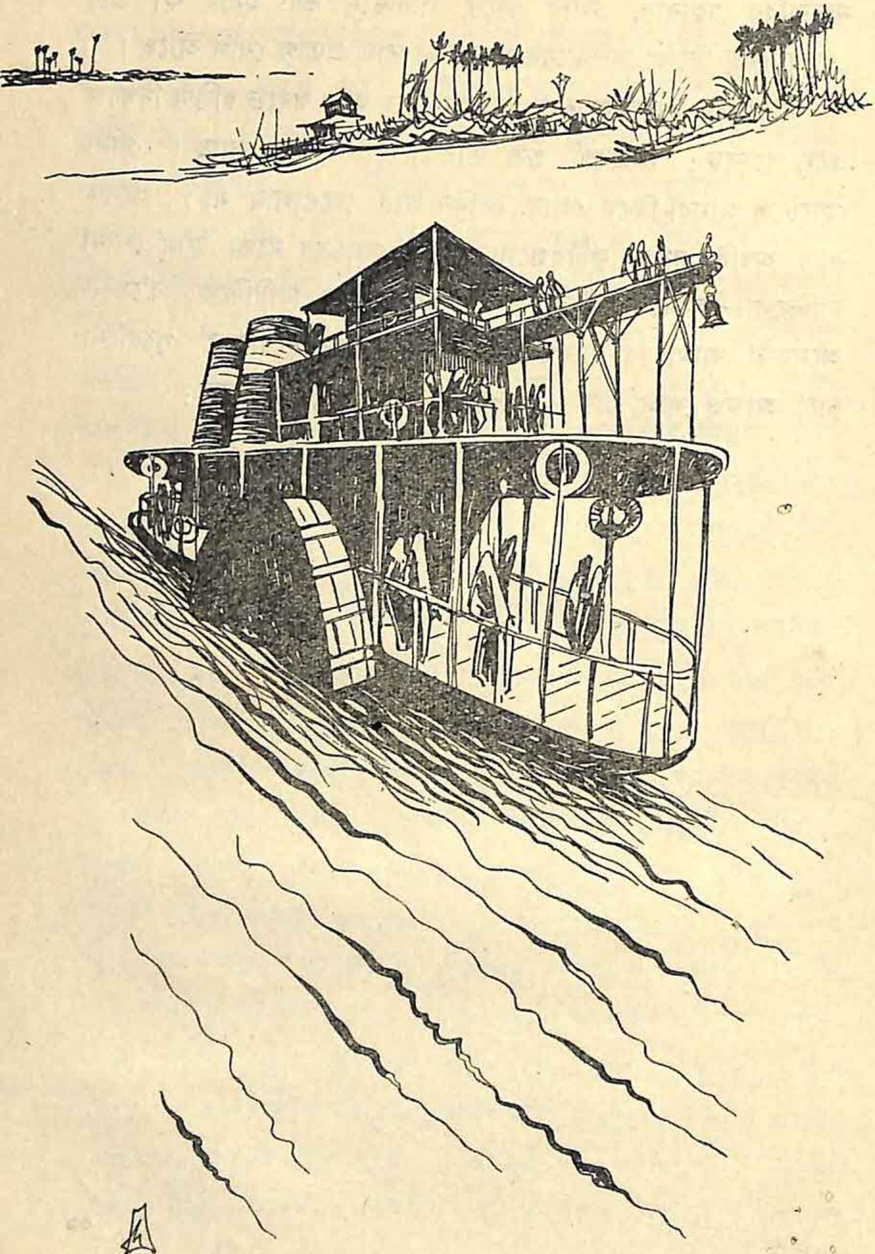
তারা, শুধু খুশি হয়েছিলো তাদেরই সমবয়সী চির-যৌবন কবির সঙ্গ পেয়ে। সমস্ত য়ুরোপের প্রাণ একদিন জর্মানিতে গিয়েই আমরা অনুভব করেছিলাম, বেঠোফেনের জর্মানি, গ্যটে-হাইনের জর্মানি, তাপস বিজ্ঞানী হেল্‌ম্ হোলট্‌জ্, টমাস্ মান্ এবং আইন্‌স্টাইনের জর্মানি। সংস্কৃতিতে ভারত শাস্ত্রবিৎ মহামনীষী কত বন্ধু জর্মানি থেকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন—তাঁরাই কাণ্ট-হেগেল-ম্যাক্সমূলারের গুণবংশীয়। অনন্ত জর্মানিকে, তাদের জনসাধারণকে প্রীতির বন্দনা জানাই।

যে-সময়ে আণবিক ধ্বংসব্যবসায়ীরা দানবিক শক্তি প্রয়োগ ক'রে চলেছে, শান্তির দিগন্ত যে-যুগে আজো দূরে প্রচ্ছন্ন, সেই কালেই চলো যাই একটি জর্মান পল্লীতে। নাৎসীরা কি মিউনিক্ ছাড়িয়ে সেই যে ব্যাভেরিয়ার ওবার-আমের্গাও গ্রাম—যেখানে যিশুখৃষ্টের জীবনোৎসর্গ দেখানো হতো—তাকে নিস্পন্দ ক'রে দিয়েছে? আজকের দিনে কি সবই সম্ভব। ওখানে বিদেশীর বিরুদ্ধশক্তিও যে সাংঘাতিক পুষ্পবৃষ্টি ক'রে পুণ্য পল্লীটিকে জ্বালিয়েছে তা মনে হয় না। "প্যাসান-প্লে"—যে নাট্যে খৃষ্টের মৃত্যু পর্যন্ত মহান্ মুহূর্তগুলো অনন্ত জীবনের পটে প্রতিফলিত হয় তা ব্যাভেরিয়ার শৈল গ্রামের একান্তে গিয়ে দেখে আসি চলো। দশ বছরে একবার এই মহানাট্য দেখবার নিয়ম; মনে রাখতে হবে ভগবান যিশুকে অভিনয় মঞ্চে—হোক না ধর্মনাট্য—নামানো য়ুরোপের ধর্মবিশ্বাস বিরুদ্ধ, ওবার-আমের্গাও তার ব্যতিক্রম। সকাল থেকে সন্ধ্যা একটি দিন অভিনয় হয়—রঙ্গমঞ্চের চারিদিক খোলা, নাট্য চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে দূরের আসল পাহাড়, গরু চরছে, রাখাল বালক গাছের তলায় ছায়ায় ব'সে আছে। ভুবন নাট্যের সঙ্গে মহাপ্রাণের পরম অভিনয় সে কী আশ্চর্য সহজভাবে মিলে যায়। নাটকের বিষয়ে কিছু

বলবো না—ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার বেদনা যে কোনো ধর্মাবলম্বীর চিত্তে অনন্ত করুণায় ভ'রে ওঠে, শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা দেয় না, শান্তির ধারা বইয়ে দেয়। বুঝতেই পারো, ঐ পল্লীর কোনো কোনো বিশেষ পরিবারে খৃষ্ট-জীবন অভিনয়ের পরম্পরা চলে আসছে—হঠাৎ কারো সাধ্য নয় ঐ নাট্যে নামতে পারে। যিনি আজীবন খৃষ্টের ভূমিকায় নামেন তাঁর ছবি দেখেছি—তাঁর চেহারাতেও দিব্যতা প্রকাশিত। তাঁরই বংশের আরেকজন ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, দেখলেই আদর্শিক ভাব মনে আসে। অথচ একেবারে পল্লীগ্রামের মানুষ—ঐ ঠাণ্ডা শৈলপল্লীর নিভৃত সীমা ছেড়ে কোথাও যাননি। বরফে গ্রাম ঢেকে যায়, ঝোড়ো হিম হাওয়া চতুর্দিকের উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া থেকে বয়ে আসে, আবার একদিন বসন্তের কচি পাতা, কচি মুকুল, নীল মুখশ্রী দেখা দেয়—অন্তরে খৃষ্টলীলার আয়োজন দশ বছর ধ'রে তৈরী হয়ে ওঠে। দেশ-দেশান্তের মানুষ—বিশেষ ক'রে নানাদেশীয় জর্মান ছেলে-মেয়ে এবং বড়োরা তীর্থ অভিনয়ে উপস্থিত হতে থাকে। মেলা বসে যায়, যেমন আমাদের দেশে, উৎসবের বাঁশি হাওয়ায় আনন্দ-বিষাদের সুর ঢেলে দেয়। বিজয়া দশমীর দিনে যেমন পূজো, আনন্দ, বিদায়, বেদনা একটি ভাষাহীন কারুণ্যে এক হয়ে বুকে বাজতে থাকে, তেমনি এখানকার প্যাসান্-প্লের দিনে। রবীন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়ে সারাদিন অভিনয় দেখলেন—অগণিত জনতার কেউই প্রায় জানতো না, তিনি কে। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার হলো। যখন বিকেলে তিনি নাট্য লোকালয় ছেড়ে চলে আসছেন, সম্ভ্রমে দু-পাশের গ্রামবাসী জর্মান মেয়ে-পুরুষ স'রে দাঁড়ালো। হঠাৎ তাদের যেন কেমন অবাক বোধ হলো। দু-একজন ভক্তি নম্রস্বরে বলে উঠলো, খৃষ্টুস্, খৃষ্টুস্। জর্মান ভাষায় খৃষ্টকে বলে খৃষ্টুস্। এসিয়ার

মহাকবির চেহারায়, চলার ধরণে, পরিচ্ছদে ওরা হঠাৎ কী ভাব পেলো সেই দিনের অভিনয়ের সঙ্গে যেন তার প্রত্যক্ষ যোগ আছে।

সায়াহ্নের আলোক তখন পাহাড় বেয়ে ক্ষীণ স্বর্ণাভ রক্তিম দিগন্তে এসে পড়েছে; দু-একটি শুভ্র তারকা দূরে চেয়ে আছে। গ্রাম্য হোটেলে আমরা ফিরে এলাম, সেদিন আর বেরোলাম না। অনেক রাত অবধি জর্মান কুটীরগুলো থেকে স্তোত্রের মতো 'হীম্' শোনা যাচ্ছিলো—অনেকে মিলে গাইছে—আগুনের চারিদিকে ব'সে—অনেকটা আমাদের সামগানের মতো, যেমন য়ুরোপের পুরোনো চার্চে আজও শোনা যায়। সে-গান কি জর্মানিতে থেমেছে?



বরিশালে

খুলনায় গিয়ে নাক-উঁচু একটা ষ্টীমারে চড়ে ব'সেই—চলো যাই বরিশালে। চতুর্দিক ঘন বরষার জলে ভর্তি, সবুজে চোখ ডুবে যায়, কালো কাজল-মেঘময় দিনে ছবির মতো গ্রাম, কোথাও রোদ্দুর পড়ছে আড় হয়ে। যাই বলো—এমন বুকভরা দৃশ্য আর কোথাও নেই। বহু হারানো বৎসরের পূর্বস্মৃতি জন্ম জন্মান্তরের পরিচয়ে ভ'রে আছে—এই আকাশব্যাপ্ত মেঘলা আলো আর নীচের কচি চারা ধান আর নদী-কল্যাণী লোকালয় সবাইকে পূর্ব-অঞ্চলের ভাষায় ভ'রে তোলে। হয়তো তোমাদেরও অনেকে ঐ অঞ্চলেরই —তারপর শহরে এসে আছো—হয়তো বা কী মজা, তোমরা অনেকে শহরে আর গ্রামে আসা-যাওয়া করো। আমি তো বহুদিন নদী পথে যাইনি—এবারে ষ্টীমারে খানিক এগিয়ে মধুমতী নদীকে সর্বস্বান্ত ভালোবেসে ফেললাম। কোথাও রোদে ঝিকিয়ে উঠছে তার ঢেউ, বসন্ত উদাত্ততার প্রাণসলিলে সারি সারি ডিঙি-গহণার নৌকো জলের উপর ঘরোয়া সংসার পেতেছে, দু-পাশে মাঠ গ্রাম সুপুরির বন। হাটের ব্যাপারী, মাঝিদের আনাগোনায় নদী ধারাময়ী।

পাটের চর আর আখের চর—
মেঘবরণী মেঘ।
রূপোলি জল ঢেউ তুলে বয় আমার মধুমতী॥
হাটের নৌকোয় হাঁড়ি-কলসি
উঁচু সাজানো কুমড়ো শসা
গাঁয়ের ধারে টিনের ছাতের বাড়ি।
রূপোলি জল ঢেউ তুলে বয় আমার মধুমতী॥
চোখ জুড়োয় গো, চোখ ডুবে যায় ধানের শিষে
পাটের চর আর আখের চরে ;
সিঁদুর-সোনা দিনের শেষে অস্তমণি গো —
রূপোলি জল ঢেউ তুলে বয় আমার মধুমতী॥

স্টীমার ঘাটে গাল-ফোলা, টুপি মাথায়, মুসলমান ছেলেরা এসেছে, জায়গাটার নাম নাজির হাট। কোন্ বাড়ির খোকা এরা, কে জানে। নৌকো ক'রে শসা, তাজা ডিম, দুধ বিক্রী করতে এসেছে গ্রামের লোক। অনেকের পরনে লুঙ্গী, খালি গায়ে রোদ পড়েছে, কখনো ঠায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। শান্ত দৈন্য-মাখা মুখের ভাব, কত প্রাত্যহিক সংগ্রামে আজো নম্র এদের মন, কতখানি সহজ চরিত্রবলে দৃঢ় এদের জীবনী। সংসারে হারে না যে তা নয়, মৃত্যু অস্বাস্থ্য দীর্ণ-দৈন্য সর্বত্র। সংঘশক্তির অভাব বার বার এদের গ্রাম্য সমাজকে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে যেমন ভেঙে পড়ে ঢেউ-লাগা নদীর পাড়। কিন্তু তবু দেখো এদের বীর্যের অবসান নেই। এরাই বাঁচবে। এই আমাদের হিন্দু-মুসলমান গ্রামবাসী অগণ্যেরা বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদেরও। খুব আশার কথা তাদের অত্যন্ত পল্লীজীবনেও প্রাণের দাবি জেগেছে, সেই দাবি—দয়া নয়—আমাদের চিত্তে এসে ঘা দিচ্ছে। জীবনের সব অধিকার দেবার-নেবার দ্রুত ভার সম-যোগে গ্রামে

চলো যাই

শহরে আমাদের তুলে নিতে হবে। রাষ্ট্র-গগনে আজ নতুন আলোর পতাকা উড়ছে, দেখেছো কি?—আবার গ্রাম্যজীবনেও প্রাণের চাঞ্চল্য জেগেছে—জেনো, চতুর্দিকের সমস্ত হতাশার মধ্যেও এইটেই সত্য। হিন্দু-মুসলমান এই নদী-চারী, কৃষিজীবি সংখ্যাহীন পরিবার প্রতিদিনই সহযোগী হাটে-ব্যবসায়ে এক জীবিকার জাল বুনছে, যেমন ক'রে তারা মাছ ধরবার জাল বোনে, এক গলায় প্রাণের সুর তুলেছে, যেমন করে সারি গানে, জারি গানে বহু কণ্ঠের সুর মেলে।

তাই বলি, অবিশ্বাসীর কথা শুনো না। বরিশালের গ্রামে এসে দেখো। ঐ যে দুষ্টু ছেলেরা বার বার জলে লাফিয়ে সাঁতার দিচ্ছে, বারণ শোনে না। ওরা কে বলো তো? রাম না রহিম না এমনি দুষ্টুমি ভরা ছেলে যেমন হওয়া উচিত। তেমনি যদি মোল্লার হাটে নেমে চুড়ির দোকানে যাও তো গোল গোল হাত বাড়ানো মেয়েদের নাম ঠিকানা দরকারই হবে না। ওরা একই রকম খুকী শ্রেণীর মানুষ। সুতরাং দাঙ্গার কথা শুনেও গ্রামে গিয়ে চাঙ্গা হওয়া যাক। গরম রসগোল্লা, টাটকা মুড়ি খাইয়ে বাজে কথার মুখ বন্ধ করা ভালো—এরকম চিকিৎসায় বোধ হয় কারো আপত্তি নেই। বরিশালের লোকেরা এই রকম ব্যবস্থা ভালো রকমই জানে—পাতে ইলিশ মাছ আর সুগন্ধি চালের ভাতও বাদ পড়বেনা যদি ভাগ্য উঠন্তি হয়।

এই দেখো তো, গান শুনতে শুনতে কত রকম কথা ব'লে ফেললাম। জীবন আর জীবিকা কীভাবে মিশে যায়, বড়ো আশ্চর্য! গানেও তাদের অবাধ মেলামেশা। সুমন মাঝির গানের কথা যদি বলি তাহলে আমার বরিশালী ভাবটা বুঝবে। ছপ্ ছপ্ ক'রে বৈঠা পড়ছে, ডিঙি নৌকোয় কে এক সুমন মাঝি, কোনো এক ঘরের বধূর কথা গান ক'রে দরিয়া পাড়ি দিচ্ছে। সারি গানের সুর, কথাগুলো খানিক শোনা যায়, খানিক নয়। বার বার বলছে, তার মন পাওয়া

ভার। গোলা ভরা ধান দিলাম, সুপুরি দিলাম, পান দিলাম, পাটের শাড়ি কিনে দিলাম, রাতে দিনে সোহাগ দিলাম, সবরি কলা, মোয়া দিলাম—তবু তার ম—ন পাওয়া ভার।

আরো বলছে, যতন দেবো, রতন দেবো, খাঁটি রূপোর মতন দেবো সোনার অঙ্গে সাজায়ে চ—ম—ৎ—কার ; কিন্তু তবু তার মন পাওয়া ভার॥ মাঝি শেষ-বিদায়ের সময়ে কেবল দান-দাতব্যের তালিকাই বাড়িয়ে চলেছে। "ম—ন পাওয়া ভার॥ শঙ্খ-কড়ি গণি' দিলাম, দুধের-বাছামণি দিলাম—যাই চলো এবার॥" কে একজন বললে, এ গানের উত্তরও আছে। ঘরণী শুধু তো ঘরকেই চায়না, সংসারের অন্য সবাইকার সঙ্গে সে মাঝিকেই যে চায়। কী ক'রে সুমনের মন ফেরাচ্ছে শোনো, এর পরে কি উপায় আছে ?

—"সুমন মাঝি কোন্‌খানে যাও
নৌকাখানি বাইয়া।
আমি ঘরেতে রই মনের দুঃখে
তোমার পথ চাইয়া।
বাজু-পৈঁচি-পাটের শাড়ি,
কিছু না চাই—এসো বাড়ি,
গরম মুড়ি নারকেল দিয়া
প্যাট্ পুরে যাও খাইয়া॥
ইলিশ মাছ যদি পাও,
আমার তরে আইনে দাও,
ঘরেতে রই মনের সুখে
ছেলে-মেয়ে লইয়া।
সুমন মাঝি পায়ে পড়ি
এসো নৌকা বাইয়া॥"

সন্দেহ হচ্ছে ছড়ার কথাগুলো শহরে তৈরী, কিন্তু গ্রামের ভাব মাখানো। যাদের প্রাণ থেকে এই রকম গভীর সুখ দুঃখের কথা ছোটোখাটো ঘর সংসারের প্রসঙ্গে জড়িয়ে গ্রামে গ্রামে গীত হয়, তারাই তো চিরন্তন।

মন আমার কেবলি কথা কইছে। নদীর দু-ধার ছুঁয়ে প্রাণের স্রোত চলেছে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই চেয়ে দেখার পিছনে একটি দিব্যদৃষ্টির চাওয়া আছে মনে হয়। নারকেল গাছের সারি ঘাট থেকে সরু হয়ে গ্রামের পথে চলে গেছে, খড়ে ছাওয়া ছোটো ছোটো ঘরে উঠোনে আমাদেরই জীবন। পূর্ণিমার আলোয় ছলছলিয়ে কত ভাব অন্তর্লীন হয়ে ভেসে যাচ্ছে, শ্যামলা পুরোনো এই অঞ্চলের মগের কথা। বরিশালে এসে পৌঁছই। ষ্টীমার ঘাটের নামগুলো কী সুন্দর: খুলনা, মোল্লারহাট, ঝালাকাটি, নলচিটি, বরিশাল। আরো কত নাম আছে। বরিশাল থেকে আমতলা যেতে পারো, অগাধ জলের ধারে, নয়তো ভোলা, গৈলায়। নয়তো তারবুজিয়া, কলাশকাটি, বাগাবন্দর, পটুয়াখালি, গলাচিপা হয়ে অবশেষে খেপুপাড়া।

খেপুপাড়ায় গিয়ে খেপে যাবো। দুইরার দিকে ভাসান্। প্রকাণ্ড জল সেখানে সমুদ্রের, আর মগের মুল্লুক। মনে ক'রোনা কল্প-কথা বলছি, মগের মুল্লুক যদি দেখতে চাও তো বরিশাল পটুয়াখালির ধারেই পাবে। আরাকানের দিক থেকে এসেছিলো মগেরা, সে অনেক পুরুষ আগে, এই অঞ্চলের নানাস্থানে তারা বসবাস করছে।

রাত একটায় আমার কাজ শেষ হলো বরিশালে—তখন এসে ষ্টীমারে শুলাম। রাঙাভোরে ষ্টীমার ছাড়লো। বরিশাল শহরটি বেশ দেখতে, কীর্তনখোলা নদীর উপর জমিয়ে বসেছে। যে-দিকটায় নদীর ধার দিয়ে দিয়ে শহরের রাস্তাটা ঝালাকাটি পর্যন্ত চলে গেছে, সুপুরি, ঝাউ আর পাম গাছের সারি, সামনে ভরা নদী আর

নৌকো, সেদিকটা বেড়াতে তৃপ্তি লাগে। সর্বক্ষণ নদীর হাওয়া দেয়। ওপারের গ্রাম দেখা যায়। মিশনারিরা হু-চারটে পুরোনো গির্জা-স্কুল ওদিকে রেখেছে, আজো মন্দাক্রান্তা তাদের কাজকর্ম চলেছে। দলে দলে হিন্দু মুসলমান এবং ষ্টীমার কোম্পানীর কর্মচারী—হু-এক পরিবার শিখ পাঞ্জাবী মেয়ে পুরুষ সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে বেরিয়েছে ঐ রাস্তায়। বেশ ছুটি ছুটি ভাব। শহরটা সুন্দরে-অসুন্দরে মিশোনো। যেমন হয়। বড়ো বেশি টিনের ছাতঅলা বাড়ি—দেখতে শোভমান নয়। টিনের দোতলা আর গায়ে বিজ্ঞাপন-মারা দোকান পাট। অনেক কবিরাজী ঔষধালয়। ডিষ্ট্রীক্ট্-বোর্ডের বাগানে গিয়ে বরিশাল জেলার মানচিত্র মাটির উপরে দেখে এসো—উঁচু নিচু তৈরী, নদী শাখানদী ও শহর গ্রামের নাম বসানো—ঐ অঞ্চলের প্রত্যক্ষ ধারণা হয়। বরিশাল শহরে বহু খাল। বহুতর পুকুর, হু-একটি খালে শহরের মধ্যে দিয়ে নৌকো চলেছে। পাশেই ব্যস্ত বাজার। ষ্টীমার ঘাটে নানা বিচিত্র লোকজন, গাছের তলায় চায়ের দোকান, টেবিলে সাজানো সারি সারি রঙিন লেমোনেড-সোডার বোতল, অদূরে একটা বাজনা বাজানো 'জগদীশ' সিনেমা। আদালতের পুকুর ধারে পুরোনো পুঁথি একজন সুর ক'রে পড়ছে। অশ্বিনী দত্তের স্মৃতিযুক্ত বরিশাল। "শক্তি বাহিনী" মেয়েদের বরিশাল। ঢাকার দীপালি সংঘের অনুরূপ মেয়েদের ঐ প্রতিষ্ঠান এখানে নারী প্রগতির আশ্চর্য কাজ করেছে। পথে ঘাটে বাড়ির বৌ-গিন্নী থেকে আরম্ভ ক'রে নতুন ছাত্রীদলের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত দেখতে খুব ভালো লাগে। শঙ্কর মঠও দেখলাম, এর সঙ্গে অনুশীলন দলের রাষ্ট্রিক আন্দোলন জড়িত। নানা বিচিত্র সুন্দর মস্‌জিদ। তারপর নতুন যুগের স্রষ্টা মহাপুরুষের পুণ্যবলে বিভিন্ন বিদ্রোহীদল অখণ্ড স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হলো, সাম্প্রদায়িক ঐক্যযোগের আদর্শ

এখানে বড়ো হয়ে দেখা দিলো। বরিশালের শিক্ষা ও রাষ্ট্রচেতনা বাংলা দেশে প্রসিদ্ধ। লোকে বলে, এখানে এমন একটি বাড়ি নেই—যেখানে মেয়ে গ্র্যাজুয়েট নেই বা একজন ছেলে জেলে যায় নি।

বরিশালের বিষয়ে একটি ঔৎসুক্যজনক খবর এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগে এখানে বিপিন পালের সঙ্গে এসেছিলেন, কিন্তু ডাঙায় নামতে পারেননি—শহরে তখন খুব একটা কী গোলমাল চলছিলো।

বরিশালে আর কী আছে? অপরিসীম হৃদ্যতা আর আতিথ্য, যার কোনো শেষ নেই। আর বৃষ্টির সময়ে প্রচণ্ড বৃষ্টি। ভোজনীয়ের সন্ধান যারা চাও তাদের বলি, দুধের অনাবৃষ্টির দিনেও এখানে ক্ষীর পায়েস দই আর দুধের মিষ্টান্ন খোঁজ করলে পাতে জুটবে; আর পেট ভরন্ত মর্তমান কলা। "হাপুস্ হুপুস্ শব্দ—
চারিদিক নিস্তব্ধ"।

ষ্টীমার চলেইছে।

ছবি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চ'লে যাচ্ছে।

পথ ফুরিয়ে এলো, ভালো লাগছে না, নদীর তিন চারটে বাঁকের পর খুলনা ষ্টেশনের দুটো লাল আলো দূরে খুব উঁচুতে দেখা যায়। সার্চ লাইট গিয়ে পড়লো নারকেল গাছের উপর, গুচ্ছ গুচ্ছ ডাব ঝুলছে। ছায়ায় নিবিড় গ্রামগুলো। এই অঞ্চলে এসে মনে হলো আমার আত্মীয় স্বজনের সংখ্যা খুব বেড়ে গেল। কারণ এই যে, সর্বদাই এদের হৃদয়টা ব্যবহারের খুব কাছাকাছি থাকে, গভীর সরল এদের দেবার নেবার ইচ্ছে।

এরা আমার আত্মীয় সব
মস্ত আমার পাড়া—
নদী থেকে দেখি নৌকোয়
ভেসেছি ঘর ছাড়া!

আম জাম তাল সুপুরির বন
নারকল আর কলা
ঘোলা বরণ শ্রাবণী জল
বইছে তারি তলা ;
সারি সারি গ্রামের ছবি
বুকের কাছাকাছি—
কাঁচা মাঠে বৃষ্টিতে ঐ
ধানের সঙ্গে বাঁচি ॥
ঘাটে যারা নাইছে ; যারা
জাল ফেলে মাছ ধরে।
ঢেঁকি কোটে উঠোনে, আর
রাঁধছে যারা ঘরে,
ওরা আমার ভাই বোন যে,
মা বাপের এই গাঁয়ে
ইচ্ছে করে পাশে গিয়ে
বসি গাছের ছায়ে।
ধারাময়ী নদীর জলে
নৌকো কেন ভাসাই—
ঘুরে ঘুরে বেড়াই কেন,
কেবল যাওয়া-আসাই ॥

রাখি পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় এই সব কথাই মনে হচ্ছিলো।





সীরিয়ায়

চলো যাই সূর্য-মন্দির। পৃথিবীটায় মনে হচ্ছে অন্ধ যুগ এসেছে, এই সময়ে প্রাচীন প্রথানুসারে সূর্যের পূজো করলে হয়তো মনে আলো এসে পৌঁছতে পারে। আশ্চর্য এই যে, এমন দেশ নেই যেখানে মানুষ আদিকাল থেকে সূর্যাগ্নিকে স্তব করেনি, যেখানে নীলাকাশে ওঠেনি তার জ্যোতিঃরূপ উপাসনার মন্দির। তোমরা অনেকেই দেখেছ পুরীর কাছে কোনার্ক মন্দির। তেমনি আরেকটি অপরূপ সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখেছিলাম সীরিয়ায়। তার নাম বাল্‌বেক। এখনো ঝক্‌মক্ করছে একটি অত্যুচ্চ পাথরের ফলক, তার পালিশ করা শীর্ষে সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি এসে পড়ে—জ্যোতির্বিদেরা ঐ পাথরের সাহায্যে গণনা করতেন। আসীরিয়া ও ব্যাবিলনিয়ার উপাস্য দেবতা বাল্ অর্থাৎ সূর্য ঐখানে অধিষ্ঠিত হওয়ায় জনচিত্তের আশ্চর্য বন্দনা লেবানন সীরিয়ায় শ্রেষ্ঠ তীর্থটিতে গিয়ে পৌঁছতো।

কত সুন্দর পরিবেশ তা কী বলব। আমাদের যেমন শীতের দিনে নীলে সোনালিতে হাওয়া বয়, তেমনি লেবাননের বসন্তকালের প্রসন্ন

সূর্য-স্বর্ণময় দিক্‌স্পর্শ করলাম। মৃদুহাওয়ায় চতুর্দিকে ফুল ফুটে আছে; পাহাড়ের আন্দোলিত গাঢ় নীল রেখা জ্যোতির্বর্ণ সুদূরে অবলীন। ঢালু পাহাড়ের তটদেশে আঙুরের চাষ, এদিকে ওদিকে কমলা লেবুর বাগান—যেদিকটায় বাল্‌বেক সূর্য-মন্দির সেখানে রাঙা খোয়াইয়ের মতো উঁচু নীচু। মাইল চল্লিশ দূরে ঐ পাহাড়ের ওদিকে দামাস্‌কাস্‌। মরুভূমি ভেঙে সেখান থেকে তিন সকাল সন্ধ্যা অভিযান করলে বোগদাদ। ম্যাপখানা নিয়ে বসলে বাল্‌বেক সূর্যনগরীর অবস্থান ঠিক বুঝতে পারবে, কিন্তু ম্যাপের চেয়ে বেশী দরকার কল্পনার আলো লাগা ভ্রামণিক মন, তাতেই চলন্ত উৎসুক চোখ দুটোয় মানচিত্র দেখবার দিব্য দৃষ্টি খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের মতো যদি কানে শুনতে পাও লেবানন, 'দি সীডার্স অফ্‌ লেবানন,' যদি আসীরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, ফিনিসিয়ার ঐতিহাসিক সংসর্গ স্মরণে এসে ঠেকে, তাহলে আরো খুব মজা লাগবে। ভেবে দেখো সেই ইতিহাসে পড়া হেলেন অফ্‌ ট্রয়ের টায়ার নগরী, সেই আলেপ্পো পালমীরা জর্ডন অরণ্টেস নদীর জল, মেডিটেরেনিয়ান সী-র তটবর্তী ছবির মতো দেশে কত বিস্তৃত রাজ্য সাম্রাজ্যের কাহিনী। বাল্‌বেক যেতে হলে ঐ সব স্থান হঠাৎ কাছে আসবে। প্যালেস্টাইনের ভিতর দিয়ে বাল্‌বেক সূর্যতীর্থে যেতে মধ্যে পড়বে সীরিয়ার রাজধানী বেইরূথ্‌।

সত্য কথা বলতে গন্তব্য স্থান যতই আশ্চর্য হোক, পথটা কিন্তু কম আশ্চর্যের নয়—পৌঁছনও যেমন, পথে চলার আনন্দও তেমনি। প্রথম অংশটা ধরো হাওয়াই পথ, ছোট্ট এরোপ্লেনে চ'ড়ে সুয়েজ খাল থেকে লীড্‌ডা পর্যন্ত যাওয়া যায়। একদিকে ঘনতম নীল মেডিটেরেনিয়ানের তীরে দেখি ঘোর প্রাচীন প্যালেস্টাইনের বালি। ভূমধ্যসাগরের জল মধ্যে মধ্যে হঠাৎ অগভীর, এরোপ্লেন থেকে স্পষ্ট দেখা যায় স্বচ্ছ জলের নীচে বালির দ্বীপ প্রায় উপর পর্যন্ত ঠেলে

এসেছে, যেন একটা নতুন দেশ তৈরী হবে কিংবা প্রাচীন দেশের মাটি তলিয়ে যাচ্ছে। এইখানে কোন্ আদি ভৌগোলিক যুগে প্রলয় ভূমিকম্প হয়েছিলো বলো তো? পৃথিবী চিরে গেল, মধ্য-ধরণী সাগর তৈরী হলো—নোনা জলের বান বাইবেলের দেশ প্যালেস্টাইনে প্রবেশ ক'রে ডেড্-সীতে আবদ্ধ হয়ে রইলো। দিনরাত ভেসে গিয়েছিলো, প্রচণ্ড বৃষ্টিতে—মানুষের অবস্থা কী হয়েছিলো তা নোয়াস্ আর্ক্ কাহিনীতে যেন দূরের কান্না-স্বরের মতো ক্ষীণ ধ্বনিতে শোনা যায়। সেই প্যালেস্টাইন পেরিয়ে এলাম—সেখানের কথা আরেক দিন হবে—ডাইনে সেই সিটি সেট্ অন্ এ হিল্, অপরিবর্তিত জেরুসালেম, যার কথা অনন্ত বাক্যে গাঁথা আছে। হাইফা বন্দর থেকে মোটরে ক'রে যেতে হয় সীরিয়া। কিন্তু হাইফা থেকে চ'লে যাওয়া সহজ কথা নয়। ঐ সেই গিরি কার্মেল্, সমুদ্রের উপর শৈল বনানী বিস্তার ক'রে চেয়ে আছে। লাল টালিঅলা সুন্দর বাড়ি, বাগান বাড়ি, সমুদ্রে উঁচু নাক-তোলা জাহাজ, ছোটো জাহাজগুলো কেউ যাচ্ছে সাইপ্রাস্ দ্বীপে, কেউ ব্যস্ত হয়ে চলেছে আয়োনিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জে, অথবা দার্দানেলিস্ দিয়ে ইস্তাম্বুল পেরিয়ে আরো দূর তুরস্ক প্রান্তে কোনো শহরে।

বলতেই বলে—ইরাণ, তুরাণ, লেবানন—মানুষের ইপ্সিত সুন্দর দেশ। পৃথিবীর এই অঞ্চলটা অভাব্য রমণীয়। সদ্য-কাটা পাইন গাছের সুগন্ধি কাঠ দিয়ে তৈরী একটি ইহুদি হোটেলে ছিলাম—য়ুরোপ থেকে পালানো একটি অধ্যাপক, তাঁর স্ত্রী-কন্যার সাহচর্যে এই ক্ষুদ্র হোটেল বানিয়েছেন হাইফার সমুদ্রতীরে। সেখান থেকে চললাম আক্রা, টায়ার্ বেইরূথের দিকে। মধ্যে পেরোলাম সীডন (আধুনিক নাম সাইডা)। মনে পড়ে বাইবেলের সীডন, গমোরা।

এই রাস্তাটা ইতিহাসের বুক চিরে চ'লে গেছে। অদূরে ট্রয়! হোমারের কাব্য এই তীরের বাঁকে বাঁকে জড়ানো, মনে হয় অনন্ত

বীর্যকাহিনী, অমরাবতী অশ্রু-আনন্দের ঘটনা এই বালিতে মাটিতে হাওয়ায় করুণ হয়ে আছে। ফিনিশিয়ান্ বন্দরগুলোর সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষ, চীনের অবিস্মরণীয় যোগ। জানো তো, চীনদেশ থেকে 'পশমের রাস্তা' এই নীল বন্দরগুলোতে এসে ঠেকেছিলো। মঙ্গোলিয়ার প্রান্ত থেকে যাত্রা ক'রে সেই আশ্চর্য পথ 'মধ্যপথ' বামিয়ানকে ছুঁয়ে এসেছে—সেই বামিয়ান, যেখানে হিন্দুকুশ পাহাড়, যেখানে ভগবান বুদ্ধের গিরিগাত্র খোদিত অভয় মহীয়ান মূর্তি আজো জেগে আছে। মনে করতে স্বপ্নের মতো লাগছিলো যে, একদিনও বামিয়ান শৈলপল্লীতে দাঁড়িয়ে এই ফিনিশিয়ান্ তটের দিকে মানস নেত্র মেলেছিলাম। পরে এইখান থেকে আমার ভারতীয় মনকে তীর্থে পাঠালাম হিন্দুকুশের হিমশিখা প্রদীপ্ত আর্যাবর্তের প্রত্যন্ত সীমায়। বেইরূথে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা রাত্রির দ্বীপমালা এই সীরিয়া বন্দরের উঁচু নীচু পথে জ্বলছে। দীর্ঘ দিনের রাস্তা শেষ হলো। ভোর থেকে মোটরে চলেছি, পথের প্রায় অনেকখানিই ঠিক সমুদ্রের উপর দিয়ে এসেছে, ডানদিকে পাহাড়। মধ্যে মধ্যে চা-খানা সরাই-খানা। রাস্তায় চেয়ার পাতা, রাস্তার উপর দিয়ে তোরণের মতো ক'রে দ্রাক্ষাকুঞ্জ ঘুরিয়ে বসানো হয়েছে। কতটা এর ফরাসী, কতটা বোগদাদী তা বলতে পারিনা—আগে মনে হতো রাস্তায় চেয়ার টেবিল সাজিয়ে রেস্তরাঁ, ছোটো ছোটো পাত্রে কালো কফি খাওয়া এসব ফরাসী বিধি, কিন্তু পরে দামাস্কাস্ আর বোগদাদে গিয়ে বুঝেছি মান্ধাতার আমল থেকে এমনি চ'লে আসছে। অনেক জিনিসই যা অত্যাধুনিক য়ুরোপীয় মনে হয়, যেমন ধরো পরনের কোট পাতলুন বা অনেক রকম টুপি তাও এমনি পূর্বতন পূর্বীয়। তার মধ্যে চীন দেশকেও ধরতে হবে। আজও নানা প্রাচীন দেশে তার চল; ওরা পশ্চিমের অনুকরণ করেছে মাত্র।

ফরাসীরা রাজত্ব শাসনে যতই পাপ করুক না কেন, আর সব য়ুরোপীয়দের চেয়ে এরা বিদেশে—অন্যের দেশে—সৌন্দর্যের মর্যাদা রক্ষা করেছিলো। ইন্দোচীন, কম্বোডিয়ায় তাই। কিন্তু সব বদলালো। ইংরেজরা হালে সীরিয়ায় এই বেইরূথ, রুমানা, দামাস্‌কাস্‌, আলেপ্পোতে কলকাতার স্ট্র্যাণ্ড রোডের মতো প্যাকবাক্স সদৃশ বাড়ি তুলতো, গঙ্গার লাবণ্য শোভা নষ্ট ক'রে তারা যেমন কুশ্রী কল আর কয়লার ঘাঁটি বসিয়েছিলো, মেডিটেরেনিয়ানের জনপদগুলোতে সেই ব্যাপার দেখা দিতো। হাইফা বন্দরটাই দেখোনা, তার রূপশ্রী প্রায় বধ করতে বসেছিলো। ক্রেন আর জেটির জটলা কেবল প্রতাপেরই সাক্ষ্য দেয়, রুচি মানবিকতার নয়। বেইরূথে এসে চমকে উঠতে হয়, আরো অভ্যন্তরে লেবানন সীরিয়া তো নয়ন-মন-মুগ্ধকর। বাড়ি-ঘর-দোর-শহর প্রকৃতির সঙ্গে মেলানো। দোকানগুলো প্রফুল্ল, বাজার লোকালয়ের মধ্যে পূর্ব এই ভূখণ্ডের রীতি ছন্দ মিশিয়েছে ফরাসী আমেজ লাগা নতুন ভঙ্গীতে। স্টাউরা নামে এক ক্ষুদ্র শহরে গাড়ি থামিয়ে চা পান করলাম—সেখান থেকে তো নড়তে পারা যায় না। যেমন দৃশ্যময় রেস্তরাঁর বাগান কানন, যেমন হৃদ্যতা ভরা আতিথ্য, তেমনি মন-কেমন করানো ছায়াময় ঘুরন্ত রাস্তা, দু-পাশে থলো থলো কালো আঙুর ফলে রয়েছে। আমার সঙ্গে পশ্চিম দেশীয় পথিক যিনি ছিলেন তাঁর দৃষ্টি তখন আরো রঙিন, রঞ্জিত ; কারণ এখানে এসে সোনালি সুগন্ধি দ্রাক্ষারস পান না করাই পাপতুল্য—অভ্যাসদোষে আমাকে পাপী হতে হয়নি, কিন্তু তিনি চোখে মনে মদির অজ্ঞান। পরে আমার সঙ্গে ফরাসী সীরিয়ান চিত্রবৎ স্টাউরা নগরীর শৈলপথে বেড়াতে বেরোলেন। কিন্তু সূর্যের মন্দিরে যেতে হলে বিলম্ব চলে না —মোটরের শঙ্খ বেজে উঠলো—আমরা গাড়ি ধ'রে বাল্‌বেকের দিকে চললাম, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে। শীত শীত ক'রে এলো,

অপরাহ্ন ম্লান সোনায় মিলিয়ে এলো ; সূর্য মন্দিরের শহরে পৌঁছলাম সন্ধ্যায়।

রাত্রেই মন্দিরের ভাঙা উঁচু প্রস্তর অঙুলি দেখে এলাম, নির্দেশ করছে জ্বলন্ত নক্ষত্রের দিকে। চতুর্দিকে বিরাট পাথরের খণ্ড ত্রস্ত বিক্ষিপ্ত—সহস্র বছর চলে গেছে, প্রায় দু-হাজার বছর, সময়ের ধ্বংস পেরিয়ে এই নির্জন ভগ্ন মন্দির অনন্ত সময়ের দিকে অঙুলি মেলে আছে। ভোরের অরুণক্ষণে এইখানে ফিরে আসবো ঠিক ক'রে পাহাড়ি অতিথি-ভবনে চলে এলাম।

বেক্ কথাটার অর্থ শহর। বাল্‌বেক্ হলো সূর্যের শহর। গ্রীকরা তাই একে বলতো হেলিয়োপলিস্। গ্রীক সভ্যতা প্রতিষ্ঠার আগেই এখানে সূর্য পূজো হতো, কিন্তু গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য বিস্তারের পরবর্তী ঢেউ লেগে এর ক্ষতি হয়নি, সীরিয়ান শহরের মধ্যে এইটেই সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী হয়ে শোভমান ছিলো। রোমানরা খৃষ্ট পরবর্তী ১৫ সালে বাল্‌বেকে যে আশ্চর্য সৌর মন্দির তৈরী করে, তারই ধ্বংস চিহ্ন আজ এখানে দেখতে পাই। আশ্চর্য পাথরে যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হলো আরব, তাতার ও তুর্কীদের বারম্বার আক্রমণে তার এই ভগ্নদশা। তার উপর এল ভূমিকম্প। আজ স্মৃতি-ভারে মন্দিরটার উজ্জ্বল প্রস্তর পড়ে আছে, ভারমুক্ত সেই দিব্য উপাসনা এখানে আর নেই। কিন্তু মনে মনে অনেকখানি ফিরে পাওয়া যায়, যেমন পাই মানসিংহের মন্দিরে, কোনার্কের ভগ্নচক্র সূর্য-সারথী দেবালয়ে। বাইবেলের ইস্রাইলীদের কাছে যিনি স্বয়ং জিয়োভা, যিনি আদিত্য রূপে অন্যত্র বন্দিত—তাঁকে নমস্কার। পরম জ্যোতিষ্ক যিনি, তাঁকেই ফিনিশিয়ান্ সীরিয়ানরা 'উচ্চতম নক্ষত্র পুরুষ' এই নামে পূজো দিয়েছে। তাঁকে আমরাও নমস্কার করি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, যদি কোন প্রতীকের পূজো করতে হয় তাহলে

সাক্ষাৎ সূর্যদেবকেও পূজো দিতে প্রস্তুত আছি—আমাদের পৃথিবীর আলোক-দাতা, প্রাণদাতা এই সূর্য। জবাকুসুম সংকাশং এই সূর্য, এই প্রদীপ্ত রূপ সামনে রেখে বৈদিক মন্ত্র রচনা হয়েছিলো, আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। প্রাচীন বিদেশে এনে এই মন্দিরের ক্ষেত্রটি দেখলে তোমাদের মনে খুব আলোর ভাব লাগতো। দেশের প্রাচীন ভাব মনে আসতো। এতটা পথ পেরিয়ে, এমন সুন্দর নতুন পরিবেশের মধ্য দিয়ে অভিযান ক'রে বাল্‌বেক্ পর্যন্ত আসা সত্যই একটি তীর্থযাত্রা। এখন জায়গাটি ৪৫০২ ফুট উঁচু, ছোটো একখানি গ্রাম। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ঝর্ণার ধারা। নানাদেশের যাত্রী সমাগম হয়, তাই ছুটি চারটি হোটেল দোকান এরি মধ্যে প্রাণবন্ত হয়ে আছে। কিন্তু মন্দিরের প্রাণও যায় নি—ঐ দেখো, ভাঙা পাথরের মধ্যে উৎকৃষ্ট কারুনির্মিত একটি পাথরের ঈগল পাখি সূর্যের দিকে চেয়ে আছে। ঈগল পাখি হলো সূর্যের বন্ধু। খৃষ্ট-পূর্ব-পাঁচ শতাব্দী যুগের সীরিয়ান চোখ দিয়ে ঐ পাখির দিকে চেয়ে দেখলাম।

অরেকটা কথা, তুষার ও গরম সিরোক্কা বায়ুর দেশ এই সীরিয়া, অলিভ-আঙুর-তুঁত আর সোনালি যব ক্ষেতের এই সীরিয়ায় আজ স্বাধীনতার হাওয়া এসে পৌঁছলো। য়ুরোপীয় বা তুর্কী কিংবা অন্য দাসত্বের শৃঙ্খল আর তাকে বেঁধে রাখতে পারলো না। স্বাধীন ভারত থেকে তোমরা স্বাধীন সীরিয়ায় যেতে চাও তো বেশী দেরী করোনা।



অক্সফোর্ডে

চলো যাই যৌবনের রাজ্য অক্সফোর্ডে। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আর এক নতুন দিনের ছেলেমেয়ে; নিশান উড়ছে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সভ্যতার।

বাইরে আধুনিক যুগের তুমুল স্রোত, বাড়ি, গাড়ি, মানুষের ভিড়, কিন্তু ঐ ধূসর দেয়ালের ও-পাশেই দেখো, মধ্য-যুগ শান্ত হয়ে আছে। প্রকাণ্ড কাঠের দরজা খুলে ঢুকলে এক মুহূর্তে ৮০০ বছর পেরিয়ে যাবে, সেই দ্বাদশ শতাব্দীর অক্সফোর্ডে। পুরোনো গাছ, চূড়া-তোলা কলেজের সৌধ, ঘুরোনো সিঁড়ি আর সোনার টুকরো বাগান। বাগানের প্রধান বাহার এই যে, তাতে পুরু ঘাসের সতরঞ্জি ছাড়া প্রায় কিছু নেই, চোখ ডুবে যায় নিস্তরঙ্গ গাঢ় গভীর সবুজে। অনেক সোনার গিনি খরচ ক'রে অমন চির শ্যামল উঠোন রাখা যায়। তাই ওর মূল্য অমূল্য হলেও দামী। আর দেখো লনের চতুর্দিকে ধূসর পাথরের দেয়ালে আইভি, লাইলাক্, হানি-সাক্ল্ ঘূর্ণী লতা উঠেছে, বসন্তে ফুলের আবির চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। রং আর ধরে না। মধ্যে মধ্যে অতি গম্ভীর ধ্বনি ঘণ্টা বাজছে ঢং-ঢং।

চলো যাই

অনেক রাতে আমার ঘর থেকে শুনতাম বহু শতাব্দীর সুরে ভরা বড়ো বড়ো গির্জার ঘণ্টায় প্রহর বাজছে, নানা ঘণ্টার নানান্ ঐকতান, আগে পরে বাজে। উর্ধ্বে শীতের তারা। প্রবাসীকে কে যেন ঘরে ডাকছে। কলেজের ধারে বহু প্রাচীন গলি রয়েছে, পাথরের ফলকে মোড়া—হাঁট্‌লে খট্ খট্ শব্দ হয়, পুরোনো আমলের স্ট্রীট্ ল্যাম্পের কাঁচ দিয়ে গ্যাসের আলো পাথরে প'ড়ে চিক্ চিক্ করছে। ঢং ঢং ঢং। যদি ভোরের ঘণ্টা শুনে কোনো চূড়ার ঘর থেকে অক্সফোর্ডের দিকে চেয়ে দেখো, তাহলে বুঝবে—কেন এই শহরকে বলা হয়েছে 'হাজার চূড়ার শহর'। কুয়াশায় ঠাণ্ডা গোলাপী আকাশে দেখবে কত শীর্ষে শীর্ষে শূন্যটাকে জালি-কাজ ক'রে দিয়েছে। দিগন্তের এপারে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। শুধু গির্জার চূড়া নয়, পুরোনো কলেজ এবং বিবিধ প্রতিষ্ঠানের শিখর উঠেছে শূন্যে।

কিন্তু কত ভীষণ ব্যস্ততা এই কলেজের দেয়ালগুলোর ভিতর। যৌবনের রাজা যারা তাদের চার হাজারের উপর ছেলে এখানে থাকে। আর ছাত্রী যারা তাদের তরুণী রাজ্ঞী বলতে পারো, সংখ্যায় কম হলেও তাদেরও প্রদীপ্ত মুখ, উন্নত মাথা, আনন্দিত চোখের উৎসাহ। পড়ায় শোনায় স্বাস্থ্যে অক্সফোর্ডের নবীন রাজত্ব তারা বিস্তার ক'রে আছে। অর্থ এদের অনেকের নেই, অক্সফোর্ডে সবাই ধনীর ছেলেমেয়ে এটা ভ্রান্ত ধারণা। কিন্তু প্রাণের ঐশ্বর্যে এরা সম্রাট। এদেরই জন্যে অগণ্য সুসজ্জিত আয়োজন, বেড়াবার পার্ক, ভ্রমণের বন, অসংখ্য খেলার মাঠ—এমনকি তাদের নৌকো বাইবার জন্যেই যেন চার্‌ওয়েল ও টেম্‌স্ নদী রূপোলি ক্ষুদ্র জলধারায় এক হয়ে মিশেছে শহরের ভিতরে। জলের ধারে ধারে নিবিড় বনচ্ছায়া, বসবার জায়গা, কোথাও কাঠের সাঁকো।

লাইব্রেরির তো লেখা জোকা নেই, পৃথিবীর কোথায়

বডলিয়নের মতো আশ্চর্য গ্রন্থাগার আছে বলো? প্রত্যেক কলেজে আবার অগাধ বইয়ের স্বতন্ত্র স্নিগ্ধ মনন-কেন্দ্র। জগতের কত শ্রেষ্ঠ মনীষী এখানে ছাত্র ছিলেন। কত মহাজ্ঞানী অধ্যাপক শুভ্র চুল দূরদৃষ্টি ভরা চেহারা নিয়ে প্রাচীনকালের উৎকর্ষ এখানে রেখে গেছেন। কত কবি ছিলেন যাঁদের পদধ্বনি আজো কল্পনায় শোনা যায়—ঐ পথ দিয়ে চলে গেছেন সেক্স্পীয়ার, ছাত্র শেলী দাঁড়িয়েছিলেন মড্লিন ব্রিজের ধারে, ব্রাউনিং ব'সে ব'সে আমারই কলেজে, বেলিয়েল্ কলেজে বই পড়েছেন, দুরূহ সুন্দর কবিতা লিখেছেন। নিউটন ছিলেন কেম্ব্রিজে, কিন্তু এখানেও চরম বিজ্ঞানীদের অনেকে তপস্যা ক'রে গেছেন। যারা আজ নবীন ছাত্রের বীর্যবেশে অক্সফোর্ড অধিকার করেছে, তাদের উপর আলোকিত অলক্ষ্য আশীর্বাদ এই শহরে নিরন্তর বর্ষিত হচ্ছে সন্দেহ নেই।

অক্সফোর্ড শহরের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় অষ্টম খৃষ্টাব্দে। তখন এখানে ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা তাপসের স্মারণিক পূজোর কেন্দ্র ছিলো—দলে দলে লোকে পূজো দিতে আসতো। প্রাচীনতম অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরের মতোই অক্সফোর্ড প্রথমে ছিলো ধর্মায়তন, পরে হলো বিদ্যায়তন। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে এখানে মধ্যে ব্যবসার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিলো, একটি দুর্গও ছিলো। দশম একাদশ শতাব্দীতে ডেন্রা কয়েকবার এই শহর অধিকার করবার চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে ওঠবার পর থেকে আট-শ বছর অখণ্ড ধারাবাহিকভাবে এখানে জ্ঞানের সাধনা চলেছে। এত যুদ্ধ বিদ্রোহেও, এমন কি এই শেষ অতি মহাযুদ্ধেও, এখানকার সৃষ্টিশীল জীবন বিনষ্ট হয়নি। একুশটি কলেজ এই ক্ষুদ্র শহরটিতে আছে —প্রত্যেক কলেজই একেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো—সব মিলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একক কাজ চলেছে। তাছাড়া সঙ্গীতের,

শিল্পের, চিত্রকলার, স্থাপত্যের বহু প্রতিষ্ঠান আছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত নয়। বিজ্ঞানেরও সেই রকম। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেও ঐ সকল বিষয়েই শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ধর্ম শিক্ষারও বড়ো কেন্দ্র অক্সফোর্ড, তারও বহু প্রতিষ্ঠান চতুর্দিকে। এমনিভাবে ওখানে এত রকম উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না হয়েও ওখানে গিয়ে নানা বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা করা চলে।

তরুণরা যেমন রাজত্ব করছে, তেমনি প্রাচীন অধ্যাপকেরাও ওখানে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন অধিকার ক'রে আছেন। তাঁদের মধ্যে দেবতুল্য চরিত্র দেখেছি—যেমন অধ্যাপক গিলবার্ট্ মারে। অক্সফোর্ড শহরের বাইরে 'বোর্স্ হিল' পাহাড়তলীতে থাকেন তিনি। গ্রীক সভ্যতার প্রভাব তাঁর ব্যবহারে, অমায়িক ভাষণে এবং তাঁর তুলনাহীন গভীর জ্ঞানগর্ভ রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। অক্সফোর্ডের একটা মজা এই যে, য়ুরোপের সর্বপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক এমনকি রাষ্ট্র নেতাদের পথে ঘাটে বেড়াতে দেখা যায়, তাঁদের বক্তৃতা শোনা যায়। ওখানে নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁরাও সম্মানিত বোধ করেন। অক্সফোর্ডের উৎকর্ষ এমনি প্রসিদ্ধ যে, এখানকার ছাত্রমণ্ডলী ডাক দিলে সমগ্র য়ুরোপের প্রসিদ্ধ লোকেরা সাড়া না দিয়ে পারেন না। আমার খুব গর্ব ছিলো বিখ্যাত নিগ্রো গায়ক মনীষী পল্ রোবসন্‌কে আমার ঘরে এনেছিলাম—বেলিয়েল্ কলেজ আমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ ছিলো। মনে রেখো, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট্ লেকচার দিতে এসেছিলেন—"মানুষের ধর্ম" ছিলো তাঁর বিষয়। তাঁকে দেখে ছাত্র, অধ্যাপক এবং সমস্ত অক্সফোর্ড শহরের জনতা অবাক হয়ে গিয়েছিলো—মানুষের চেহারা যে তার দৈবভাব প্রকাশ করতে পারে উজ্জ্বল সুন্দর মহিমায়, তা সকলে মুগ্ধ হয়ে দেখলো। দূর

ভারতবর্ষের পূর্ণরূপ তাদের কাছে প্রতিভাত হলো। এই যথার্থ ভারতবর্ষকে জানা ইংরেজের পক্ষেই হয়তো সবচেয়ে কঠিন ছিলো।

শীতে অক্সফোর্ডের আর এক মূর্তি। যেন সমস্ত শহরটা মাথায় গায়ে শুভ্রতা মেখে ধ্যান করছে—আবার বসন্তে নিশান ওড়ানো রাজনা-বাজানো ফুলে ফুলন্ত অক্সফোর্ডের সে কী অন্য চেহারা। কিন্তু সব সময়েই অক্সফোর্ড সুন্দর, দেখতে দেখতে চোখে নেশা লাগে। পড়াশোনা, খেলা-গান, উৎসাহ-অভিযান, নির্জন জ্ঞান তপস্যা—সবই সারাবছর লেগে আছে। অক্সফোর্ড ডিবেটিং সোসাইটি জগৎ প্রখ্যাত, সেখানে বাক্যের ফুলঝুরি, সেখানে বুদ্ধির চমক অতুলনীয়। সেখান থেকে ভবিষ্যৎ ইংলণ্ডের নেতারা মনকে শানিয়ে বানিয়ে প্রস্তুত ক'রে নিচ্ছে। নাট্যাভিনয়েও অক্সফোর্ড অগ্রণী—মনে রাখতে হবে, স্ট্রাট্‌ফোর্ড-অন-এভন্ বেশী দূর নয়; জগতের সম্রাট নাট্যকার ছিলেন সেইখানে। অনেক সময় মনে হতো এই রকম যৌবনের রাজত্ব ছাত্রের শহর যদি আমাদের থাকতো, এই রকম স্কুল-কলেজ, শিল্প সাহিত্য, বিজ্ঞানের আনন্দ কেন্দ্র, আর প্রাণেভরা, গানেভরা স্বাধীনতা! দশ হাজার মাইল দূরে সমুদ্র পেরিয়ে নারকেল বৃক্ষ শোভিত সূর্য-স্নাত ভারতী বসুন্ধরার কথা মনে ক'রে তবু ভাবতাম, চলো যাই ফিরে। সেইখানে আবার হবে আমাদের নালন্দা, তক্ষশীলা। শিক্ষার ঐশ্বর্য গড়বো আমরা, হতবুদ্ধি সরকারী শিক্ষা-কর্তাদের রাষ্ট্রীয় দাসত্ব স্বীকার না ক'রে আমরা বাস করবো সৃষ্টিশীল মনের বিশ্ববিদ্যালয়ে। নালন্দায় কোন্ আদিযুগে দশ হাজার কি তারো বেশী ছাত্র বাস করতেন, চৈনিক পর্যটক যা লিখে গেছেন তা প'ড়ে জানি পৃথিবীতে অন্য কোথাও এত বৃহৎ বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তখনো সমগ্র এসিয়ার ছাত্র আসতেন ওখানে পড়তে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী যে আদর্শ নিয়ে, আনন্দ নিয়ে নবীন ভারতবর্ষের ভিত্তি

গড়েছে, তারই মন্ত্রশক্তি সর্বত্র ছড়িয়ে আবার আমরা জ্ঞানের সঙ্গে প্রাণের মিলন ঘটিয়ে উজ্জ্বল মানবাকাশে তুলবো আমাদের সভ্যতার চূড়া। অক্সফোর্ডে একলা নদীর ধারে চেরি ফুল ঝরানো গাছ তলায়, কখনো চেষ্টনাট্ গাছের বৃহৎ পত্রশোভিত হেমন্ত রৌদ্রে ব'সে প্রবাসী একটি ছাত্র এইসব কথা ধ্যান করতো। পাশে পড়ে থাকতো আধ-খোলা বই, মন কোথায় চ'লে গেছে।



ডেনমার্কে

ডেনমার্কের কথা বলতেই মনে পড়ে রূপকথার দেশ। হান্স্ আণ্ডার্সনের গল্প কাহিনীর এই মায়াপুরী, দেশটাকে সেই হিসেবে শিশুতীর্থ বলা যেতে পারে। কেননা দেশবিদেশের কম আর বেশী বয়সী শিশু—সবার মনোহরণ করেছেন আণ্ডার্সন। তাই কোপেনহেগেন রাজধানীতে গিয়ে প্রথমেই লোকে যায় মৎস্য-নারীকে দেখতে—সেই 'লিট্‌ল মারমেড্' এর মূর্তিকে —পাথরে গড়া অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি জলের ধারে ব'সে আছে সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে। যেন হঠাৎ কোনো দিন গল্পের মৎস্য-নারীর মতো নীল জল, প্রবাল মাণিক্যের পাতালপুরীতে সে হঠাৎ ফিরে যেতে পারে। কোপেনহেগেনের শোভনশ্রী লাঙ্গে-লিনিয়ে পাড়ায় হান্স্ আণ্ডার্সনের স্মরণে ডেনমার্কবাসী এই মূর্তিটি তৈরী করে রেখেছে। সমগ্র পৃথিবী থেকে লোক যায়—ঐ লিট্‌ল মারমেড্-কে দেখতে।

যখন কোপেনহেগেনে পৌঁছলাম আমিও পথ চিনে চিনে অনেক রাতে ঐ মৎস্য-নারীর করুণা-ভরা উন্মনা চলি-চলি মূর্তিটি কাছে

গিয়ে দাঁড়িয়েছি। রাতের জাহাজ থেকে সার্চ-লাইট জ্বল্‌জ্বল্ করছে চতুর্দিকের জলে, অল্প ঢেউ কাঁপছে, দূরে একটা বাগানে বাজনা বাজছে। হঠাৎ মন কেমন ক'রে উঠল। মনে হলো, পরীর মতো সবাই আসে এই পৃথিবীর সুন্দর তীরে, কিন্তু প্রাণের খানিকটা প'ড়ে থাকে অদৃশ্য আরো কোন্ একটা রহস্যলোকের দিকে। যেন যাবো যাবো। অথচ দেখো, আলো আর ঢেউ—আর সুন্দর শহরের বাজনা-বাজানো অপূর্ব সংসারেই আমরা তো আছি। হান্স্ আণ্ডার্সনের মতো গল্পের রাজা আসেন এইটুকু মনে করিয়ে দিতে যে, প্রাণের কাহিনীর শেষ নেই, অনেকখানি তার জানা আবার অনেকখানি অজানা। চোখ বড়ো বড়ো ক'রে মানুষের শিশু-মন শোনে সেই জানা-অজানার কল্প-কথা।

ডেনমার্ক আমি দেখেছিলাম আকাশ থেকে, যেন একটি সবুজ বিন্দু, নীলায় বসানো। মরকত মণির ছোট্ট দ্বীপ। কাছে নামলে বোঝা যায় দ্বীপ একটি নয়, কিন্তু ঘন সংলগ্ন। ট্রেনে ক'রে যখন যাওয়া যায়, ট্রেনসুদ্ধ জাহাজ এ-দ্বীপে ও-দ্বীপে চলে যায়, নামতে হয় না। হাওয়ার পথে যতই মাটির দিকে নামি অপরূপ বাড়ি-নৌকো-সমুদ্র-শহর-গাঁথা ডেনমার্ক মন হরণ ক'রে নেয়। চোখে পড়ে অগণ্য সবুজ চূড়া। অক্সফোর্ডের মতো, কিন্তু কোপেনহেগেনের চূড়া পুরানো তামার তৈরী বলে তাতে সবুজ ছাতা পড়েছে, সোনায় সবুজে মেশা ভারি চমৎকার দেখায়।

নেমে ভাবি এই তো আর্টের দেশ, লোকশিক্ষার আধুনিকতম উৎকর্ষের দেশ, হ্যামলেটের দেশ ডেনমার্ক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম যেবার ডেনমার্ক গিয়েছিলাম আমরা সোজা উঠলাম এল্‌সিনোরে। ঐ তন্বী শহরটি সুইডেনের কাছে, দুই দেশের মধ্যে এপার ওপার দেখা যায়, মধ্যে এক-ফালি নীল সমুদ্র। ষ্টীমার পারাপার করছে, নিশান উড়ছে, লাল টালিঅলা বাড়ি ছোটো ছোটো দ্বীপের দিকে

নৌকো চলেছে। সেই এল্‌সিনোরে রয়েছে প্রসিদ্ধ ক্রোনবর্গ কাস্‌ল্‌, পুরানো দুর্গ, অদ্ভুত মনোহর স্থাপত্য, হ্যামলেটের নাটক এই জায়গাটিকে অমর ক'রে দিয়েছিলো। কোপেনহেগেনের খুব কাছে এই শহরতলী ; যেতে আসতে সোনালি বালি আর সোনালি গমের যবের ক্ষেত—দুই-ই দেখা যায়। আর হৃষ্টপুষ্ট পল্লীতে বিদ্যুৎ আলোজ্বালা চাষের কেন্দ্র, শান্ত নম্রভাব ছড়ানো অথচ চতুর্দিকে কর্মশীলতা। এখানে ওখানে উইণ্ড্‌মিল্‌। দুধ মাখন পনীরের রাজ্য ডেনমার্ক। মোটাসোটা চিক্কণ গরু বাছুর দেখা যায়। চাষের জন্যে ঘোড়ায় টানা লাঙল। পল্লীতে পল্লীতে নতুন শিক্ষার সহজ ব্যবস্থা। জানো তো, জগত বিখ্যাত শিক্ষা সংস্কারক গ্রুণ্ডভিগ্‌ ডেনমার্কে এমন সর্বজনসুলভ লোকশিক্ষা আর সমবায় পদ্ধতি বিস্তার করলেন যে য়ুরোপময় তা ছাড়িয়ে গেল এবং মার্কিন রাজ্যেও। রবীন্দ্রনাথ এখানে দু-বার গিয়েছেন বিশেষ ক'রে ওদের শিক্ষা ও পল্লী ব্যবস্থা দেখতে। বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা পদ্ধতিতে ডেনমার্কের দান আছে।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথকে ডেনমার্ক ভালোবাসে তার কারণ তিনি গানের রাজা, গল্পের রাজা। নোবেল প্রাইজ পাবার পর যখন রবীন্দ্রনাথকে সুইডেনে যেতে হয়েছিলো, তিনি কোপেহেগেনে ক'দিন ছিলেন। ডেনমার্কবাসী তাঁকে সারাপথে মশাল জ্বেলে শোভাযাত্রা ক'রে সান্ধ্য সম্মান জানিয়েছিলো—রাত্রে ষ্টেশন থেকে তিনি ঐ প্রাচীন পদ্ধতিমতে, আলো জ্বালা পথে চলেছিলেন। মহাসমারোহে তাঁকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হলো।

ডেনমার্ক বলতে কী মনে হয়, বলি শোনো :

(ক) অগণ্য বাইসিক্‌ল্‌। যেখানে যাও সারে সারে বাইসিক্‌ল্‌ আরোহী আর আরোহিণী। জানো, কোপেনহেগেনে প্রত্যেক বড়ো রাস্তার একদিক আলাদা করা আছে দ্বিচক্রবাহীর জন্যে।

(খ) স্যাণ্ডউইচ্। বলতে পারো পৃথিবীর যত রকম স্যাণ্ড্উইচ্, যত সুন্দর দেখতে সুন্দর খেতে, সবই ডেনমার্কের টেবিলে পাওয়া যায়। এমন কি অটোম্যাট্ যন্ত্রে পয়সা ফেলে কল ঘুরিয়ে দিলেই নানারকম স্যাণ্ড্উইচ্ বেরিয়ে আসে, ফলে, সব্‌জিতে, মিষ্টিতে, নোন্‌তায় স্তরে স্তরে সুস্বাদু সাজানো। আইসক্রীম্-এর স্যাণ্ড্উইচও, পেতে পারো।

(গ) টাইকোব্রাহীর দেশ ডেনমার্ক। অতোবড়ো নক্ষত্রবিৎ পুরাকালের য়ুরোপে কমই দেখা গেছে। তারকামণ্ডলীর স্থান নির্দেশ করার যন্ত্র বানিয়েছিলেন, নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন, পৃথিবীর প্রতিবেশী উজ্জ্বলী চাঁদের ষোলকলার বিকাশ তথ্যও তিনি নির্ধারিত করেন। পৃথিবীটা স্থির থাকে তাঁর এ বিশ্বাসটা সত্য ব'লে প্রমাণ হয়নি, কিন্তু এই অস্থির যুগে মনে হয় ওঁর ধারণাটা মন্দ ছিলো না। তবে এই বলতে পারো যে, পৃথিবীর গোলক যতই ঘুরুক থামুক মানুষের মনটা যদি ঊনপঞ্চাশীতে ঘুরপাক খায়, তাহলে সব একই কথা।

(ঘ) আর মনে ক'রে দেখো কিং ক্যান্যুটের কথা। বীর্য মদমত্ত সম্রাট ইংল্যাণ্ড-নরওয়ে-ডেনমার্কে একচ্ছত্র রাজত্ব বসিয়েছিলেন। বালির ধারে চেয়ারে বসে সমুদ্রটাকে বলেছিলেন দূরে থাকো ; পায়ের কাছে এসোনা। সে গল্প জানো ?

(ঙ) আধুনিক ডেনমার্কের কথা উঠলেই লোকে বলবে নীল্‌স বর্ পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়ে নাম করেছেন ; ইয়েনরেন্ গুনরসেন্ প্রসিদ্ধ গল্প লেখক। এঁদের নাম সবাই জানে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা ডেনমার্ক হাসতে জানে, অন্যের ভালো করে, লোকের চোখে-মুখে সহজ আনন্দের ভাব। বিখ্যাত হবার কারণ কোনো মস্ত বড়ো একজন লোকের মধ্যেই পাওয়া যায় না,

চলো যাই

জনসাধারণের হৃদ্যতা, কর্ম কুশলতাই তার উৎস। শেষ পর্যন্ত তাই মনে থেকে যায়।

নীল চোখ সোনালি চুল শান্ত খুশির দেশ ডেনমার্ক। সেই প্রাচীন জলদস্যু ভাইকিং-এর দেশে প্রাণের বহ্নি আজো তেমনি জ্বলছে, কিন্তু তার প্রকাশের দীপ্তি কত স্নিগ্ধ।

ভারতবর্ষে ডেন্‌রা এসেছিলো প্রধানত হুগলি নদী বেয়ে, উপনিবেশ গড়েছিলো বাংলার শ্রীরামপুরে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ তৈরী করায়, ভাষার প্রচলনে ডেনিশ মিশনারিরা খুব সাহায্য করেন। ইংরেজ প্রতাপ যখন মধ্যমার্তণ্ডে আরোহণ করলো, ডেন্‌রা ধীরে ধীরে ভারত ভূমি থেকে চলে গেল। কিন্তু তাদের দান আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

ডেনমার্কের আজো কোনো কলোনি, বিদেশে অধিকৃত রাজ্য নেই। উত্তর সমুদ্রে গ্রীনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড ইত্যাদি দ্বীপে তাদের সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিলো, এই যুদ্ধের পর তাও ছেড়ে দিলো। কত ছোটো অথচ কত সম্পূর্ণ রাজ্য ডেনমার্ক—বেশী চায়না ব'লে তার সবই আছে।

প্রচণ্ড যুদ্ধের আক্রমণেও এবার ডেনমার্কের স্বাধীন ভাব একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। ঐ দেখো, লিট্‌ল্ মারমেড্ আজো তাকিয়ে আছে দূর নীল জলের দিকে। তার চোখে অপরাজেয় প্রাণের আহ্বান; কেউ তাকে ভয় দেখাতে পারেনি। কিন্তু মানুষের তীরে বেদনা সংঘাত দেখে সে যেন বলছে, যাই যাই। অথচ আমাদেরই সঙ্গে আছে সুদূর চিরন্তনের কাহিনী বলবার জন্যে। সংসারে ছুঁইয়ে রেখেছে রূপকথার মায়াকাঠি। ঘুরে আসি চলো হান্স্ আণ্ডার্সনের তীর্থদ্বীপ ডেন্‌দের দেশে।



মস্কো শহরে

ওখানে নতুনের হাওয়া লেগেছে। শেষ যুদ্ধটার ধাক্কায় শহর পরাজিত না হলেও খানিক বিধ্বস্ত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওখানকার বীরপুত্র-কন্যারা নিশ্চয়ই তেমনি তেজে পৃথিবীর ঐ একটি সুন্দর শহরকে আরো গ'ড়ে তুলেছে, যেমন আমরা প্রথম দেখেছিলাম সতেরো বছর আগে। যেদিন সেই ১১ই সেপ্টেম্বরে মস্কোর হোয়াইট্ বল্টিক ষ্টেশনে আমরা পৌঁছুলাম, সত্যি মনে হলো, চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। সবাই যেন অপূর্ব প্রাণে ভরা। য়ুরোপের পুরোনো মাটিতে নতুনী নেশা লেগে মানুষজন, রাস্তা, শহরতলী শীতের রোদ্দুরে ঝক্‌ঝক্ করছে। রবীন্দ্রনাথের কত আনন্দ! বার্লিন থেকে তাঁর জন্যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণে একটি বিশেষ কামরা ট্রেনে জুড়ে দেওয়া হয়েছিলো; তাতে চারটি ঘর; বসবার ঘরের জানালা দিয়ে তিনি কত উৎসাহে দেখতে-দেখতে আসছিলেন, আমাদের দেখাচ্ছিলেন। জর্মান সীমান্ত পেরিয়ে পোল্যাণ্ড, তারপর হঠাৎ রাশিয়া। ধরণ দেখলেই বোঝা যায়; ঐ স্মলেন্স্ক,

শেষে বিচিত্র আশ্চর্য শহর—ঐ মস্কো। কোথায় এসে পৌঁচেছি, দূর থেকেই মনে হয় এটা যথার্থ নতুন দেশ, য়ুরোপ অথচ য়ুরোপ নয়। আকাশের গায়ে পশ্চিম আর পূর্ব দেশের গির্জা—গম্বুজ। প্রাচীন অট্টালিকা আর অত্যন্ত আধুনিক স্থাপত্যের পাশাপাশি উৎকর্ষ। লোকজন চলছে নানা রকম, য়ুরোপীয় এসিয়ান ভাবের আমেজ নিয়ে। ওয়ার্‌শ ষ্টেশনে যখন গাড়ি থেমেছিলো, পোল্যাণ্ডের ঐ রাজধানীর মস্ত অভ্যর্থনা ভিড় ঠেলে কবির দৃষ্টি খুঁজছিলো ভিশ্‌চুলা নদীর ধারে মিশ্রিত নানা সভ্যতার নিদর্শন। পোলিশ বাড়ি রাস্তা কৃষিকুটীরের মধ্যে এসিয়ার সাদৃশ্য চোখে পড়ে, কিন্তু রাশিয়ায় এসে প্রথম তার জমকালো পরিণতি দেখা গেল। বল্‌টিক্ সমুদ্র থেকে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত যে দেশ প্রকাণ্ড সাইবেরিয়ার এপাশে ওপাশে য়ুরোপ আর এসিয়াকে একত্র করেছে, শত ভাষা বিবিধ সভ্যতাকে আপন করেছে, সেই দেশের শহরে পদে পদে বিশ্ববৈচিত্র্য দেখা দেবে এটা বিস্ময় নয়, তবুও অপার বিস্ময়। ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখি নব্য ষ্ট্রীম-লাইন মোটরের পাশে অবিশ্বাস্য সেই আমাদের চেনা ফিটন গাড়ি, যা উত্তর য়ুরোপে কোথাও আমরা দেখিনি। আর দেখো কত রকম মানুষ। কেউ এসেছে বৈকাল হ্রদের ধার থেকে, কেউ ককেশীয়, কারো নাক-চোখের ভাব তাতারদের মতো, কেউ বা গ্রীক মুখাবয়ব এবং উত্তর য়ুরোপীয়ের নমুনা। কাপড় চোপড় য়ুরোপীয় কোট্ প্যাণ্ট্ কিন্তু গলাবন্ধের প্রাধান্য। মেয়েদের অনেকের মাথায় টুপির বদলে রুমাল বা শাল, কারো বা মাথা খালি।

মস্‌ক্‌ভা নদীর ধারে কোথাও পিচ-ঢালা প্রশস্ত পথ, আবার একটু ওদিকেই অসম পাথর বসানো সরু গলি। মোটরের চাকার তলে দুই যুগ। যথেষ্ট ট্রাম, কিন্তু যে পরিমাণে লোক হাতল ধ'রে ঝুলছে

আর ঢং-ঢং আওয়াজ, তাতে ভারতবর্ষীয় মনে অতি পরিচয়ের স্মৃতিই জেগে ওঠে। সর্বত্র লাল নিশান উড়ছে, কাস্তে আর মুগুরের ছবি অথবা লেলিন স্টালিনের; বোঝা যায়, একদিনের রাষ্ট্রীয় উৎসব নয়, প্রত্যহ চলেছে। দোকানে রাস্তায় নামের হরফও য়ুরোপের অথচ উল্টো-পাল্টা এবং কিছু অন্য, মনে হচ্ছে ঠিক অক্ষর পড়ছি কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ ভুল। যেটা মনে হচ্ছে 'E' সেটা হয়তো ঘোরতর 'P' এই রকম ব্যাপার। রেড্ স্কোয়ারে এসে তো একেবারে ধাঁধা লেগে যায়। যা দেখেছি তা বিশ্বাসই হচ্ছে না। একদিকে মুসলমানী গম্বুজের ছোটো বড়ো বুদ্বুদ মিলে মিশে অদ্ভুত গ্রীক চার্চ, অন্যদিকে ক্রেমলিনের দৃঢ় প্রচণ্ড দুর্গ-প্রাচীর, যেন মধ্য যুগের য়ুরোপ। আবার চোখ ফেরালেই দেখি, তলার উপর তলা কাঁচে-ইস্পাতে গড়া ঘোর নব্য মার্কিন যুগের বাড়ি। অথচ সমস্তই কেমন ক'রে একেবারে সম্পূর্ণ রাশিয়া—সোভিয়েট রাশিয়া।

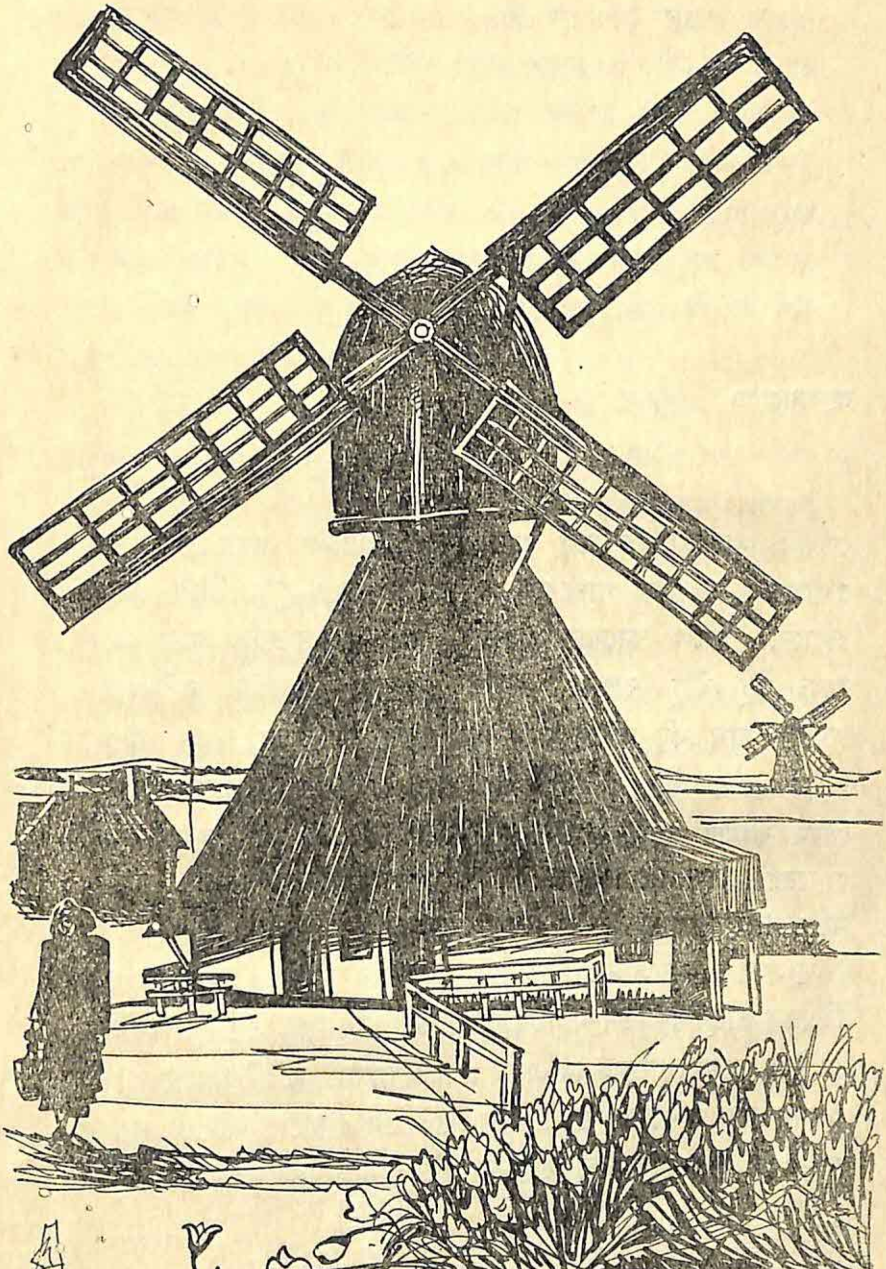
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেবারে গিয়েছিলাম, তখন মাটির তলার ট্রেন মস্কোয় হয়নি। পরিকল্পনা চলেছে। কিন্তু ছয় বৎসর পরে ১৯৩৬ সালে যখন একা মস্কোয় গিয়েছি, তখন দেখি ওখানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলোয়ে, এমন সৌন্দর্য, এমন ব্যবস্থা লণ্ডন-ন্যু ইয়র্ক-বার্লিনে কোথাও নেই। শহরের রাস্তার কত তলে লিফ্‌ট্ ক'রে নেমে গিয়ে দেখবে, ঝলমলে মার্বেল পাথরের দেয়াল, দ্রুত বিদ্যুৎ-ট্রেন চলছে, খবরের কাগজ, কফি, চকোলেট, ফল অজস্র পাবে মস্কোর পাতালপুরীতে। আর স্নানের-বিশ্রামের ঘর। রবীন্দ্রনাথকে ওরা যে হোটেলে রেখেছিলো, তাতে আসবাবপত্র ছিলো পাঁচ-মিশালি, কিছু তার জারের যুগের, যেন জরি দেওয়া নকল শোভিত, আর বেশীর ভাগ একেবারে হাল আমলের। বিধি ব্যবস্থা কোথাও সাবেকি ঢিলে, কোথাও একেবারে তৎপর

আধুনিক। পরে দেখেছি আর নেই সেই গিল্‌টি করা চেয়ার, মখমলের পর্দা সম্পূর্ণ অদৃশ্য, 'টেম্পো' সবই নতুন কালেরই। যাই হোক, পূর্ব পশ্চিমের সমন্বিত ভাব সে সময়ে ছিলো—এখনও আছে। কাভিয়ার (এক রকম মাছের ডিম, রাশিয়ার প্রিয় খাদ্য) আর আইসক্রীম, ক্রাইমিয়ার থোলো থোলো কালো আঙুর আর শীত-উত্তর মেরু প্রকৃতির রাশিয়া থেকে আনা শীল মাছের টুকরো—সবই একত্রিত হয় মস্কোর আহার-টেবিলে। মানসিক ভোজের ব্যাপারেও এই বৈচিত্র্য।

অথচ বিলাসের শহর নয় মস্কো। নানা কিছুর মধ্যে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত। একই সঙ্গে বেশীর দাবি করলে পাবে না। কম্যুনিস্ট বা অকম্যুনিস্ট সকলের কাছেই এই সংযম খুব ভালো লাগে। কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। ধনী নির্ধনের অমানুষিক পার্থক্য মস্কো শহরে তেমন চোখে পড়ে না, যা ভালো তার ভাগ সবাইকে দিতে চায়। এ পাড়ায়, ও পাড়ায় বেশী ভেদ নেই, যেমন রয়েছে চিৎপুর আর চৌরঙ্গিতে। একটাও পুরোপুরি বস্তি নেই মস্কো শহরে। বাড়ি বা রাস্তা কোথাও নতুন, কোথাও পুরানো। কিন্তু ধনের জাত বা মানের জাত অনুসারে আলাদা গণ্ডি উগ্রভাবে টানা নেই। অনেক পার্ক, থিয়েটার, বিশ্রামের ঘর মস্কোয় ছড়ানো। সকলেরই তাতে অধিকার। খবরের কাগজ পার্কে গিয়ে বিনা পয়সায় পড়ো। সারি সারি বোর্ডে টাঙানো আছে। ছবির পত্রিকা, উৎকৃষ্ট বাজনা বাজছে, বাগানে কোথাও খোলা ছাত, থিয়েটারে উক্রেনের বা জর্জিয়ার নাচ হচ্ছে। দেখো, শোনো। চিত্র প্রদর্শনী চলেছে, আর্ট গ্যালারি বা মিউজিয়ামের দ্বার খোলা; চাষী, কারখানার কর্মী, অধ্যাপক, বড়ো রাষ্ট্রপতি সবাই ভিতরে একসঙ্গে যাচ্ছে, আসছে। অর্থাৎ যা হওয়া স্বাভাবিক, অথচ প্রায় কোনো দেশেই হতে দেওয়া হয় না, তাই দেখবে

মস্কোয়। বলছি না, ওটা স্বর্গের শহর। ওখানে রাষ্ট্রীয় মতামতের দৌরাত্ম্য এবং ধর্মের উপরে পার্টির অত্যাচার দেখেছি, তখন গির্জাগুলো হয় বন্ধ, নয়তো তারি মধ্যে মিউজিয়াম বানিয়ে প্রমাণ দেখানোর চেষ্টা চলছিলো যে, পৃথিবী জোড়া সকল দেশেরই ধর্ম পরিত্যাজ্য। কিন্তু সে সব অনেক বদলেছে! এখন মস্কোয় ধর্মের স্বাধীনতা ক্রমে ফিরেছে। মস্কো শহরে তার প্রাণপূর্ণ আয়োজনটা আগে খুব ক'রে বুকে লাগতো। এখনো জানি, প্রাণের আনন্দ ওখানে থামেনি। গৃহশত্রু, বহিঃশত্রু সবই ছিলো এবং আছে। কিন্তু মস্কো শহরে বারো মাসে তেরো পার্বন লেগেই থাকে। এমন উৎসব—যাতে সবাই যোগ দিতে পারে, যেমন আমাদের দেশের মেলায়। এমন সুন্দর পুতুল আর খেলনার দোকান তো আমি কোথাও দেখিনি—যেমনটি মস্কোয়। চলে গিয়ে আমি কিনলাম লাল নীল সোনালি গলার রঙিন কাঠের খেলনা আর রঙিন সুতোর কাজ-করা রাশিয়ান জামা। চলো যাই ওখানে কোনো একটা রেস্তরাঁতে ব'সে, উল্টো ক'রে লেখা দোকানের নাম দেখবো, নানা ভাষা ধর্ম জাতির লোককে চিনবো, যারা সেভিয়েট সভ্যতায় এক হয়ে মিলেছে, ভেদ জানে না। সামোভার্-এ তৈরী চা খাবো। শেখভের 'চেরি অর্চার্ড' নাটক হয়তো মস্কোর কোনো বিখ্যাত থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে। কিম্বা শেক্স্পীয়ারের রুশ অভিনয় চলেছে। চলো দেখে আসি। রাশিয়ান সঙ্গীতও কী আশ্চর্যের। পুরোনো বরোডিন্, নতুন প্রকোভিয়েভ আমার খুব রমণীয় লেগেছে। টলস্টয়ের দেশ, টুর্গেনিভের দেশ রাশিয়া। প্রাচীন কবি পুস্কিনের দেশ রাশিয়া। আধুনিক উপন্যাস লেখক সোলোকভ্ আর বিখ্যাত মনস্তত্ত্ব-শরীরতত্ত্ববিদ্ পাভলভের দেশ রাশিয়ায় ঘুরে এলে বুঝবে, ভারতবর্ষও একদিন কীভাবে অখণ্ড ঐক্যের মধ্যে নানা বিচিত্র প্রতিভার উৎকর্ষ মিলিয়ে স্বাধীন হয়ে

দাঁড়ালো। কারো অনুকরণ আমরা করবো না, আমাদের কলকাতার জীবন আমাদের ধরণধারণ আমাদেরই থাকবে, কিন্তু মস্কো থেকে নিয়ে আসবো ওদের নতুন যুগের আস্বাদ। বাড়ি ফেরবার সময়ে কিন্তু ফিন্ল্যাণ্ড বা জর্মানি হয়ে ফেরা নয়; লেনিনগ্রাড থেকে জাহাজে চ'ড়ে ইংলণ্ড হয়ে আসাও নয়। পারি তো ট্রান্স্-সাইবেরিয়ান রেলোয়ে দিয়ে হার্বিন পৌঁছে শেষে চীনদেশের পথে ভারতবর্ষে ফিরবো। রবীন্দ্রনাথের বড়ো ইচ্ছে ছিলো তাই—নয়তো এসো স্ভেন্ হেডিনের মতো করি। রাশিয়ার ভিতর দিয়ে মধ্য এসিয়ার দরজা খুলবো—গোবি মরুভূমির বালি পেরিয়ে ঢুকবো উত্তরতম ভারতের হিমাদ্রি পথে। স্বাধীন স্বদেশে তো ফিরতে হবে। চলো যাই, ততোদিন মস্কো ঘুরে আসি। তাদের রাজনীতি অন্য, তাদের পদ্ধতি আমরা মানিনা, কিন্তু মানুষের কল্যাণশক্তি সেখানেও সামরিক হন্যতার উর্ধ্বে জেগে উঠেছে।



হল্যাণ্ডে

ছোট্ট শহর ডেল্‌ফ্‌ট্‌। এখনো তেমনি আছে যেমন স্তব্ধ মধুর ছিলো পাঁচ-শ বছর আগেকার হল্যাণ্ডে। কাঠের পাথরের বহু সাঁকো, শাদা চূড়া গির্জা এখানে ওখানে, লালে কালোয় মেশানো প্রাচীন দেওয়াল আর মধ্যে মধ্যে উঁচু নীচু রাস্তার পাশে গাছ-তলে ছোটো নদী-খাল। পুরানী কাল কী ক'রে অমন করুণ মুখশ্রী নিয়ে নতুন দিনের পানে চেয়ে আছে। উবড়ো খাবড়ো পাথর বসানো রাস্তা, যেমন কাশীর গলি, তাই দিয়ে মস্ত ফুলো কেশর আর মোটা চামরের লেজঅলা ঘোড়া ঘড় ঘড় করে বোঝাই-করা খোলা টমটমের মতো গাড়ি টানছে, গির্জার উঁচুতে টাউন্‌হলের শিখরে বড়ো ঘড়ি। কিন্তু সময় যেন চলেনি। এই ডেল্‌ফ্‌ট্‌ নগরীর ছবি এঁকেছিলেন ডাচ চিত্রকর ভার্‌মীয়র তিন-শ বছর পূর্বে। তাঁর ছবি আর এই মুগ্ধ নগরীকে মিলিয়ে দেখো। ঠিক যেন একই। অনন্তকাল ধরে একেবারে স্থির দিনের রোদ্দুর পড়েছে রং উঠে যাওয়া রঙিন দেয়ালে, সামান্য সোনার আভা; ধর্ম-ঘরের উঁচু স্থাপত্য ছুঁয়ে আছে উজ্জ্বল ঘন নীল শূন্য;

ঐ দেখ কারা যায়, ঐ সেই সাঁকো। পথে আরেকটু ঘুরলে হয়তো দেখবে স্নিগ্ধ ব্যস্ত বাজার, হাসি-খুশিতে কেনাবেচা কঠিন কাজকর্মের প্রহর যায়। চীজ বিক্রী করতে চলেছে কাঠের জুতো পরা ডাচ্ গোয়ালিনী। ছেলেমেয়েগুলোর ফুলো লাল গাল, সবার যেন একটু ভারি আর মজবুৎ শরীর, পৃথিবীর সঙ্গে খুব ভাব। ভার্মীয়রের ছবিতে এত নেই। কেবল আছে শহরের একটি অনন্ত নম্র গোপন দৃশ্য! কিন্তু আজো ডেল্‌ফ্‌ট্ শহরে গেলে সবখানির হাওয়া মনে আসে, যেন জানা কতদিনের।

ভার্মীয়র-অফ-ডেল্‌ফ্‌ট্ প্রায় সারাজীবন ঐ নগরীতে কাটিয়েছিলেন, তিনি ডাচ্ চিত্রকরদের মধ্যে 'স্টিল লাইফ্' অর্থাৎ স্তব্ধ জীবন আঁকিয়ের রাজা। রেম্‌ব্রাণ্ট্ আরো প্রসিদ্ধ কিন্তু তিনি নানা রাজ্যের বাদশা। ভার্মীয়র স্তব্ধশ্রীর তুলিকর। হল্যাণ্ডের ক্ষুদ্র দেশটি এঁর নাম বুকে ক'রে রেখেছে, খুব কম সংখ্যার ছবি এঁকে ইনি যেন আয়নার মালায় পুরোনো দিনের রূপ ধ'রে রেখেছেন।

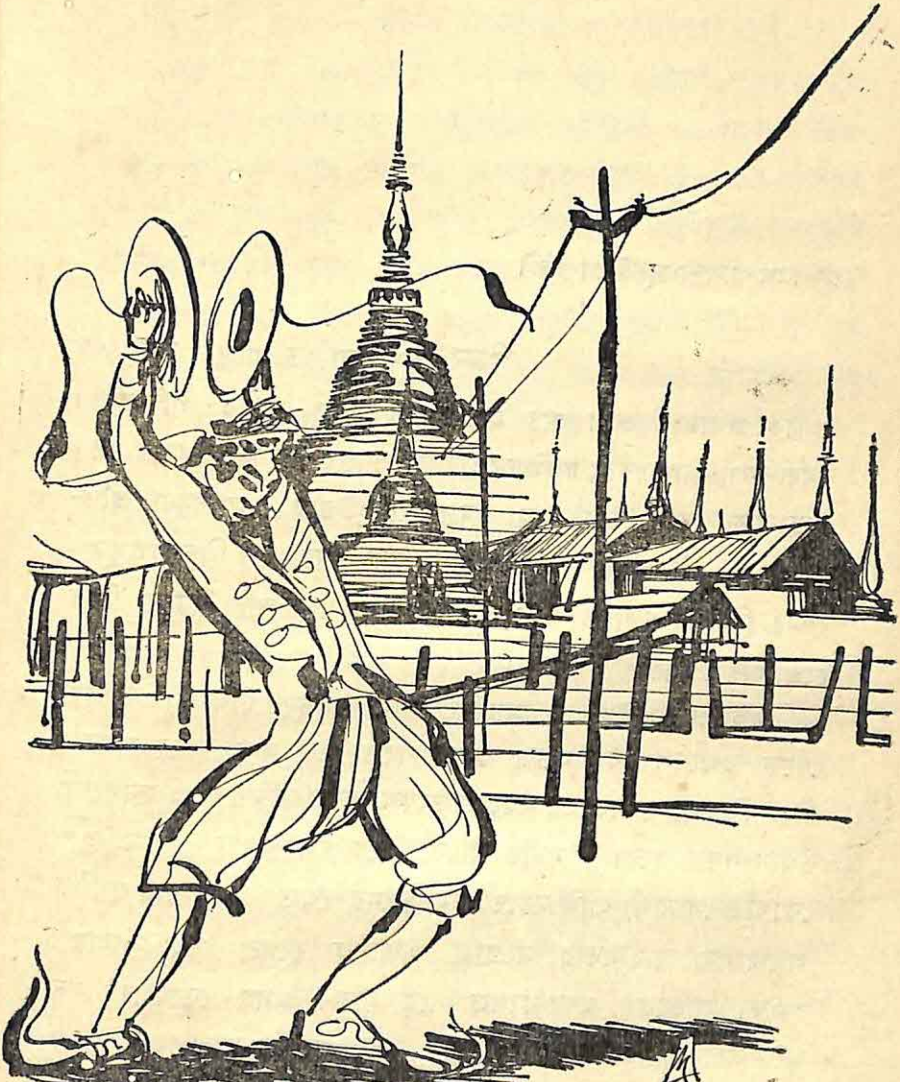
হল্যাণ্ডের হেগ্ শহরে গিয়ে যখন মস্তবিদেশের বিবিধ ভাব আমার মনে ঘিরে এলো, শান্ত হবার জন্যে গেলাম ওদের সবচেয়ে বড়ো আর্ট গ্যালারিতে—ওদের সব দেশেই ন্যাশনাল গ্যালারি আছে—কেবল আমাদেরই নেই। প্রথমেই গিয়ে দেখলাম, ভার্মীয়রের ছবি ডেল্‌ফ্‌ট্। জানো, তারপর কী করলাম? আর কথা নেই, তখনই জাতীয় চিত্রশালা হতে বেরিয়ে শাদা ঝক্‌ঝকে ডাচ্ ট্রাম গাড়িতে উঠলাম। কুড়ি মিনিট ট্রামে চ'ড়ে থামলাম এসে ডেল্‌ফ্‌ট্ নগরীতে। দু-বার ক'রে একই ছবি দেখা—একটি কত শত বছর আগে পটে আঁকা, আরেকটি আজো ইঁটে-কাঠে-জীবনে ভ'রে দাঁড়িয়ে আছে: কত ধ্রুব মাধুরীর ধ্যান, তাই দেখলাম।

হল্যাণ্ড একরত্তি দেশ, সব মিলে বীরভূম জেলার চেয়ে ছোটো,

কিন্তু একটি অখণ্ড বিশিষ্ট সভ্যতা তাতে যুগে যুগে ফল ধরিয়েছে, ফুল ফুটিয়েছে। সাম্রাজ্যলোভী একদল ডাচ্ সাত সমুদ্র পেরিয়ে জাভা-বালি-সুমাত্রায় বিষম অন্যায় করেছে, কিন্তু তাদের কীর্তন শেষ হতে বেশী দেরি হলোনা। কিন্তু জেগে থাকবে ডেল্‌ফ্‌ট্, বেঁচে থাকবে ভার্‌মীয়ের দু-চোখ ভরা ছবি। যখন প্রথম হল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম, ডুর্ন্ নামের শহরটির পাশ দিয়ে ট্রামে চ'ড়ে চলে যাই, সেখানে তখন অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজিত বীর জর্মান কাইজার্। হায়রে দর্পের পরিণাম—পাশেই দেখে এলাম দিব্যি লাল-গোলাপী-হলদে-বেগনি ডালিয়া ফুলের বাল্‌বে ভরা ক্ষেত, রঙে রঙে পাগল হয়ে হাসছে। অনেক নকল শক্তিমান ওঠে-নামে, কিন্তু ডাচ্ ফুলের স্থায়িত্ব তাদের চেয়ে কত বেশী, কত সুন্দর। বার বার এই নরম ঘাসের হল্যাণ্ড, ধব্‌ধবে তুষারে ঢাকা হল্যাণ্ড, উইণ্ড্‌মিল আর লাল কাঠের বাড়ির গ্রাম্য হল্যাণ্ডের উৎসব চলবে। ভার্‌মীয়রের কথা ভেবে আর ঐ নিরীহ প্রতিবেশী ডেল্‌ফ্‌ট্ নগরীর দৃশ্য দেখে আমাদের কি যুদ্ধমত্ত মানুষের আধুনিক কীর্তিকাণ্ডের জন্যে লজ্জা হবে না? নিশ্চয়ই হবে। সেই কথা শুনতে গিয়েছিলাম পূর্ব যুদ্ধের পর ক্লান্ত হল্যাণ্ডে। এবার আরেকটা যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবার তোমরা গিয়ে শুনো হল্যাণ্ড কী বলে। শুনবে চিরন্তন মানুষের কথা, ডাচ্ ভাষায়।



কিন্তু একটি অখণ্ড বিশিষ্ট সভ্যতা তাতে যুগে যুগে ফল ধরিয়েছে, ফুল ফুটিয়েছে। সাম্রাজ্যলোভী একদল ডাচ্ সাত সমুদ্র পেরিয়ে জাভা-বালি-সুমাত্রায় বিষম অন্যায় করেছে, কিন্তু তাদের কীর্তন শেষ হতে বেশী দেরি হলোনা। কিন্তু জেগে থাকবে ডেল্‌ফ্‌ট্, বেঁচে থাকবে ভার্‌মীয়ের দু-চোখ ভরা ছবি। যখন প্রথম হল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম, ডুর্ণ্ নামের শহরটির পাশ দিয়ে ট্রামে চ'ড়ে চলে যাই, সেখানে তখন অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজিত বীর জর্মান কাইজার্। হায়রে দর্পের পরিণাম—পাশেই দেখে এলাম দিব্যি লাল-গোলাপী-হলদে-বেগনি ডালিয়া ফুলের বাল্‌বে ভরা ক্ষেত, রঙে রঙে পাগল হয়ে হাসছে। অনেক নকল শক্তিমান ওঠে-নামে, কিন্তু ডাচ্ ফুলের স্থায়িত্ব তাদের চেয়ে কত বেশী, কত সুন্দর। বার বার এই নরম ঘাসের হল্যাণ্ড, ধব্‌ধবে তুষারে ঢাকা হল্যাণ্ড, উইণ্ড্‌মিল আর লাল কাঠের বাড়ির গ্রাম্য হল্যাণ্ডের উৎসব চলবে। ভার্‌মীয়রের কথা ভেবে আর ঐ নিরীহ প্রতিবেশী ডেল্‌ফ্‌ট্ নগরীর দৃশ্য দেখে আমাদের কি যুদ্ধমত্ত মানুষের আধুনিক কীর্তিকাণ্ডের জন্যে লজ্জা হবে না? নিশ্চয়ই হবে। সেই কথা শুনতে গিয়েছিলাম পূর্ব যুদ্ধের পর ক্লান্ত হল্যাণ্ডে। এবার আরেকটা যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবার তোমরা গিয়ে শুনো হল্যাণ্ড কী বলে। শুনবে চিরন্তন মানুষের কথা, ডাচ্ ভাষায়।



মেকং-মেনাম্-ইরাবতী

'নদীজপমালা ধৃত প্রান্তর' হঠাৎ এই শ্লোকে প্রথমেই জেগে ওঠে নদীমাতৃক বাংলা দেশের প্রতিচ্ছবি। নর্মদা-কৃষ্ণা-গোদাবরী : দাক্ষিণাত্যের বহু প্রান্তর একসঙ্গে বাঁধবার মন্ত্র। ইচ্ছামতো যোগ করা যায় তুঙ্গভদ্রা। উত্তরে গঙ্গা-যমুনা স্মৃতি-প্রবাহিনী, হিমালয়ের দুই প্রান্ত থেকে নেমেছে সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র। সুন্দর নিটোল শব্দাবলী মনে ঘুরিয়ে মানসভ্রমণের স্বাদ মিটতো কিন্তু চলো যাই প্রতিবেশীর রাজ্যে।

মেকং-মেনাম্-ইরাবতী, আরেক জপমালা, সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ঘরের কাছে কতো তট সবুজ করে আছে। ধীরে ধীরে গ্রাম্য সভ্যতা, শহরের উৎকর্ষ, কতো মন্দির-সৌধ জনপদের উত্থান-পতন হলো। নদীর বাঁকে বাঁকে ঘন অরণ্য, নির্জন হ্রদ, কোথাও সোনালী বালি নয়তো চষা-ধানের ক্ষেত। জাগলো জাতির আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম, আধুনিক যুগের শিল্প সমবায়। হয়তো আজকের খবর-কাগজ পড়ে দারুণ প্রসঙ্গ তোমাদের মন জুড়ে বসবে, হারিয়ে যাবে ইতিহাস এবং প্রকৃতির ছায়া-ঘেরা সজল

চলো যাই

মর্মরিত চলন্ত সংসার। একমাত্র সাক্ষী মনে হবে বর্মার জঙ্গলে মারামারি, তাদের পার্বত্য সীমান্তে গুপ্ত চিয়াং দলের অত্যাচার, আরো কতো কী। কেউ বলবে শ্যামদেশ (থাই), লাওস্, কাম্বোডিয়ায় খবরদার যেয়োনা, ভিয়েৎ-নামের তো কথাই নেই।

ছেলেবেলা থেকে চিত্রিত ধ্যানের মতো জেনেছি, মুখস্থ করেছি ঐ নামাবলী—দূর-প্রাচ্য আমাদেরই এসিয়ার রোমান্সে ভরা। কলকাতার গঙ্গা বেয়ে থেমেছি বে-অভ্-বেঙ্গলের ধূ-ধূ নীল ঢেউএ, সমুদ্র পেরিয়ে গেছি ইরাবতীর মোহানায়। প্রতিবেশী সালূউইন্ নদীকে কাছেই অদৃশ্য রেখে রেঙ্গুনে ষ্টীমার চড়লাম, গেলাম সোজা মান্দালয়ের দিকে। ইরাবতীর সেগুন-মেহগনি বোঝাই বঙ্কিম তীর দুই পাশে। ভ্রাতৃহত্যার বোমা ধ্বংস করেও নষ্ট করতে পারেনি বর্মার প্রাচীন মান্দালয় ভামো-কে; যদিও বিধ্বস্ত হয়েছে ঘর-বাড়ি-মানুষ। সুস্থ মানুষ আবার গ'ড়ে তুলছে ব্রহ্মদেশকে। লাসিয়ো, মিইট্কীনা, পেগু ফিরে পাবে বর্মী গৌরব, যোগ হবে সৃষ্টিশীল যন্ত্রবিজ্ঞান।

প্রোম, মৌলমেন আরাকানের ধারে আকিয়াবে যেয়ো যদি ছুটি পাও কিন্তু প্রধান গন্তব্য সোয়ে-ড্যাগন প্যাগোডা। রেঙ্গুনের এবং এসিয়ার একটি মুকুট-মণি। প্যাসিফিক্ হয়ে মার্কিন যাতায়াতের পথে কলকাতার পরে থামি রেঙ্গুনে। কলকাতা-রেঙ্গুন আজ আরো কাছে, কলকাতা-দিল্লীর চেয়েও, কিন্তু বলছিলাম বর্মার শ্রীক্ষেত্র অর্থাৎ জগন্নাথ মন্দিরের মতো প্রকাণ্ড দেবত্র সোয়ে-ড্যাগনের কথা। ওখানেও একই সঙ্গে চলেছে ব্যবসা-বাণিজ্য-ধর্মকৃত্য, রংচঙে দোকান, অন্নসত্র, ঢং ঢং ঢং, হৈ-চৈ, শান্ত মন্ত্রগুঞ্জন। সবটাই মন্দির-জীবনের অঙ্গ। কেনা-বেচা আর রথ-দেখা; কিন্তু রেঙ্গুনে রথটা বাদ পড়লো, —মাসীর বাড়িতেই বা কে যাচ্ছে বিপুল আয়োজনে। হাতী যথেষ্টই আছে দুই দেশের মন্দিরের আশেপাশে এবং জঙ্গলে ইতস্তত।

কিন্তু উড়িষ্যার সাধ্য নেই হস্তীবলে ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে। চলো প্যাগোডার ভিতরে। পরমোজ্জ্বল দেখবে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি, বিরাট সিঁড়ি-চত্বর পেরিয়ে মহাপ্রকোষ্ঠে। বেরিয়ে আবার দোকান-ভর্তি ফুলের স্তূপ, ছবির মেলা (পট নেই), ভেঁপু বাজাচ্ছে ছোট্ট ছেলে, ঠিক দেশেরই মতো। পিতলের বাসন, সোনার হাট, বর্মার আরো একটি বিশেষত্ব ওদের গালার কাজে, কালো-সোনালী-লাল বর্ণ-ঢালা বাসন পাত্রে। তা ছাড়া রঙিন লুঙ্গি আর নানারঙা ছাতা সর্বত্র, হাট থেকে এরোড্রোম পর্যন্ত। ভাগ্যক্রমে বঙ্গোপসাগরের দুই পারেই নারীরা এখনও বেশ প্রাচীন আভিজাত্য রক্ষা করে চলেছে যদিও পুরুষরা বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেকেই মজেছে হ্যাট-কোটের বিশ্বজোড়া আপিসের সজ্জায়।

কিন্তু ইরাবতীর রাজ্য থেকে মেকঙে যেতে হলে আর দেরী নয়। মধ্যে থামবো মেনাম্ নদীর ধারে—ব্যাংককে, শ্যামদেশে। মনে পড়ছে এক দুপুরের কথা। বিখ্যাত মার্কিন দার্শনিকের সঙ্গে শহরের পুরোনো পাড়ায় ঘুরছি, নদীর ঘাটে অগণ্য শাকসব্‌জির নৌকো, মনে হচ্ছে একটা চলন্ত তরকারির বাগান, জল প্রায় দেখা যায় না, যাত্রী অসংখ্য। বেশীর ভাগ মেয়ে-পুরুষের মাথায় বেতের-বোনা টুপি। এসে পড়লাম অবিশ্বাস্য স্বর্ণচূড়-মন্দিরে এবং রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন-যুগে—ভাসমান হাট-বাজার থেকে বেশী দূরে নয়। পুরোনো চৈনিক ধরনের টালি-দেয়া ছাত নানা রঙে রঙিন, অট্টালিকার সাদা দেয়াল; সৌখিন গাছের সারি, রত্ন-পাথরে তৈরী বুদ্ধমূর্তি—বিখ্যাত এমারেল্ড বুদ্ধ এইখানে—এমন সমাবেশ দেখে বিদেশী অধ্যাপক মুগ্ধ হলেন। খানিক বাদে বললেন, মানুষের সৃষ্টি এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতায় পৌঁছয়নি ঐদিকে। হল্‌দে গৈরিক-বাস শ্রমণেরা চলেছেন ধীরে, নির্মল-কান্তি নিবিষ্ট, বিবিধ পূর্বীয় যাত্রীদলের শান্ত প্রফুল্লতাও লক্ষণীয়। একবার

আমরা কয়েকজন আতিথ্য পেয়েছিলাম স্বয়ং রাজা-রাণীর কাছে, চায়ের সৌরভ এবং রূপোর কারু-পাত্রের লাবণ্য যেন ঐ দম্পতীর স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে মিলেছিলো। শ্যামদেশের প্রকর্ষ চরম ধনী পরিবারের ঐশ্বর্যে চাপা পড়েনি। অসাম্যের প্রকোপ সর্বত্র, আর্থিক একান্ত অনৈক্য শুধু এসিয়ায় নয়, পৃথিবী জুড়ে মানুষের ব্যাধি, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব দেশগুলোতে একটা তৃপ্তির ভাব এখনো আছে, যা ধনের অঙ্কশাস্ত্রে ধরা পড়ে না। ভারতবর্ষেও তাই। নিয়তি-মানা অন্ধ দৈন্যদশার কথা বলছি না, তাকে অতিক্রম করে শ্রীশক্তির পরিচয় মানতেই হবে। কিন্তু বিপ্লবী সাধনা আরো সত্য হবে—যদি মানুষের অজেয় স্বভাব, প্রকৃতির কল্যাণপ্রভাবকে স্বীকার করি। একদিকে তক্‌মা-পরা গিল্‌টি-করা প্রতাপ, সন্ত্রস্ত প্রজার দল, সামরিক কুটিল বন্ধুত্ব, নিঃশ্রেয়তার আয়োজন—অন্যদিকে পশমের শিল্প, তন্বী-নৃত্য, গ্রাম্য সংসারে সারল্যের সূক্ষ্ম আভিজাত্য; দুটোই চোখে পড়ে। শ্যামদেশের ধানী-পাড়বসানো বসতি, জল-ভরা দীঘি, মাছ-ভরা জল, তার অগণ্য ফুল-ফল মেনাম্ নদীর মতোই টিঁকে আছে। যথার্থ আধুনিক যুগের কাজ নিহিত কল্যাণকে জাগিয়ে তোলা, বহু যুগের সংযুক্ত মাধুর্য চূর্ণ করে নয়, তারই পুনরুজ্জীবনে। মনে রাখতে হবে সেই শ্যামদেশকে যা বৌদ্ধ করুণায় সমাশ্রিত।

তোমরা ভুলোনা যেন, এখানেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্নেহ-শ্রদ্ধায় বিভূষিত হয়েছিলেন। তখন শেষ বড়ো যুদ্ধের দুর্যোগ কাল। সকল মতামতের আর সমস্ত জাতি-ধর্মের উর্ধে তিনি সামাজিক ঐক্যের সন্ধান দিলেন; শ্যাম-বর্মা-মালয়ে বহু হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধরা সাম্প্রদায়িক বিভীষিকা হতে মুক্ত হলো। ব্যাংকক থেকেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের শেষ এরোপ্লেন যাত্রা।

আয়ুথিয়া অর্থাৎ অযোদ্ধা থাই দেশের প্রাচীন রাজধানী, ঘণ্টা

কয়েক কাঁচা এবং পাকা সড়কে মোটরে ঘুরে এলাম। তার বৃত্তান্ত এখন নয়, দ্রুত এরোপ্লেনে যেতে হবে কাম্বোডিয়ায়। চলো যাই প্রসিদ্ধ আংকোর-ভাট্ মন্দির শহরে। সিয়েম্-রিয়াপ্ সুন্দর অদ্ভুত নাম, সেইখানে উড়ে থামলো প্লেন, আরো কিছু দূরে জীপে গেলেই সেই দিগন্ত-জোড়া দৃশ্য। বিস্মৃত জাগ্রত পূর্বজন্মের মতো স্তরে স্তরে সাজানো কীর্তি। মেকং-মেনাম্-ইরাবতী, ভাগ্যে মেনাম্ নদীর শাখা দিক-বদল করেছিলো, রক্ষা পেলো আংকোর। শুক্নো তটবর্তী সমৃদ্ধ শহর ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হলো, প্রতিবেশী রাজাদের ঈর্ষা ঘুরলো অন্যদিকে, রাশি রাশি জঙ্গলে ঢাকা পড়লো মৌলিক স্থাপত্য ভাস্কর্যের কারুস্থিতি। বিগত ফরাসী আমলের একটি দান এই মন্দির ভূমির পুনরাবিষ্কার, পররাষ্ট্রের অমর্যাদা খানিক প্রশমিত হলো ফরাসী সভ্যতার এই আচরণে। হঠাৎ ইতিহাসের পর্দা খুলে গেলো ; কবেকার কম্বোজ, যেখানে জয়বর্মন ছিলেন নৃপতি, নবম শতাব্দীর দীপ জ্বেলে দাঁড়ালো। পাশে চম্পারাজ্যের (আন্নাম্) রাজধানী পাণ্ডুরঙ্গম্ আরো পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, সেখানে শৈলেন্দ্রবংশীয় ভারতীয় উপনিবেশ, কিন্তু প্রায় চারশত বৎসরের 'আংকোর জয়বর্মনের নেতৃত্বে যে ঐক্য-শক্তি সমারোহ লাভ করলো তা অতুলনীয়। তখনকার পশ্চিমী সভ্যতায় কোনো য়ুরোপী শহর তৈরী হয়নি, যা ব্যবসা-বাণিজ্যে শিক্ষাকেন্দ্রে ধর্মালয়ে অট্টালিকায় আংকোরের ক্ষীণতম 'প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। কারা বাঁধলো পাথরে খচিত আংকোর মন্দিরায়তন, রাজধানীর পাশেই ? মহাচীনের প্রভাব অবশ্য সমগ্র ঐ অঞ্চলের ইতিহাসে ছড়িয়েছে, অন্য মহাসভ্যতার ঢেউ এলো বৃহৎ ভারতবর্ষ থেকে (ফরাসীরা তাই সমস্ত রাজ্য দখল করবার সময় দেশের—নানাদেশের সমষ্টির—নাম দিলো ইন্দো-চীন), কিন্তু পাশাপাশি সঙ্গে ছিলো নিপুণ khmer জাতির শিল্পশক্তি। (পারো তো ম-এর উপরে খ চাপিয়ে

এবং ঐ যুক্তাক্ষরের পূর্বে একার বসিয়ে khmer বানান কোরো, উচ্চারণ করতে আরো কসরৎ চাই।) এই লাবণ্যপ্রতিভ তেজস্বী জাতির প্রধান পরিচয় আজ আংকোরের পাথরে; কোথাও বা তাদের জাতিপরম্পরা পূর্ব-দক্ষিণ এসিয়ার লোকালয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ দেখ, পুরোনো পাথরে সচল তাদের নৃত্য, তাদের প্রাত্যহিক কর্মলীলা, গৃহে প্রাঙ্গণে নরনারীর উৎসবসজ্জা, কোন্ বিগতযুগের কঠিন জীবন-সাধনা। মেয়েদের নতমুখে কারুণ্যের আভা, সংসারে আলোর নির্মাল্য প'রে কোথাও মাতৃরূপিণী তাদের মূর্তি, কোথাও পূজারিণী চলেছে মন্দিরে। ক্লান্তিহীন সিঁড়ি—উঠেছি, চেয়ে দেখেছি আংকোর-ভাটের পাঁচ-ছ-তলা উঁচু চিত্রভাস্কর্য; আবার ভাঙা পাথর, গাছের গুঁড়ি, উব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো রাস্তায় পেরিয়ে গেছি বহু মাইল-জোড়া মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মধ্যে মধ্যে একেবারে নিখুঁত এক একটি মন্দিরতোরণ, মহাকাল একটুও স্পর্শ করেনি, বলতে পারো আন্‌কোরা নতুন। হয়তো কালের ছায়া গাঢ় হয়েছে নিগূঢ় প্রস্তরগাত্রে, অলংকৃত ছবির খাঁজে যেন দূরসন্ধ্যার আকাশ। আমাদেরও ভ্রমণে সন্ধ্যা হলো, রাত্রির তারা জ্বললো আংকোরের প্রাচীন পরিখা-পারে দীঘির জলে।

একবারে শুধু চোখ-বোলানো হয়, ফিরে ফিরে বারে বারে যাবো কাম্বোডিয়ায়, আংকোরে। চলো যাই আরো দূরে—ভিয়েৎ-নামে। মধ্যে পড়ে নেবো আমরা ইতিহাসের বই, নতুন ইতিবৃত্ত অনেক বেরিয়েছে এখন ফরাসী ভাষায়, ইংরেজিতে; সমস্ত ছবিগুলো যখন কল্পনায় চারিয়ে যাবে, নতুন চোখ নিয়ে আসবো সেই পাড়ায়, যেখানে ছিলো আমাদের প্রতিবেশী টং-কিং, কোচিন্-চায়না। ফরাসী রাজত্বকালে একাকার হয়ে গিয়েছিলো তবু ঐক্য হয়নি। কিন্তু আজ নবীনপন্থী ফ্রান্স থেকেই স্বাধীন পূর্ব-দক্ষিণ এসিয়ার মিলনতত্ত্ব এসে পৌঁছলো, ভালো করে শুনতে হবে।

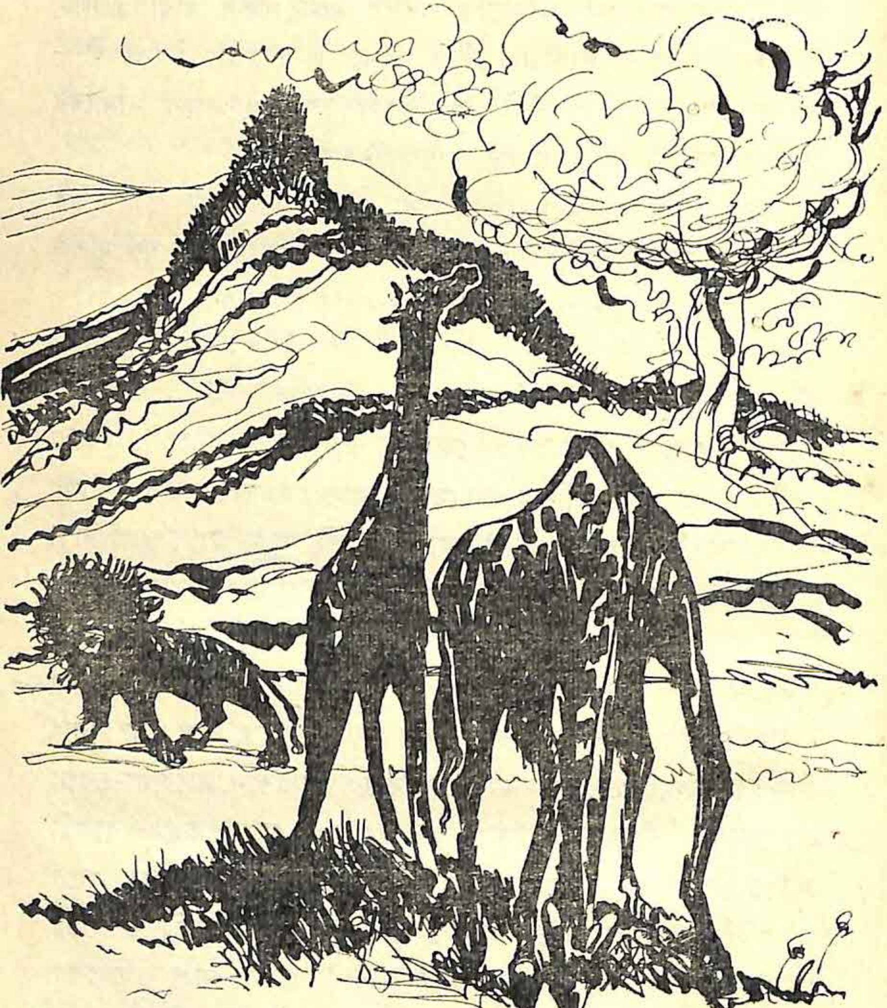
মেকঙের তীরে উড়ে এলাম সাইগন্ শহরে, অল্প কিছুক্ষণ আগেই ছিলাম জাকার্তায়। অপরাহ্নের মেঘ কাটিয়ে এরোড্রোমে নেমেই দেখি আশ্চর্য সুশ্রী জনতা, কিন্তু নর-নারীর বুকে ভিয়েৎ-নামের কী দারুণ যন্ত্রণা জ্বলছে তাও বুঝতে দেরী হলো না। হাওয়াই কোম্পানির লিমুসিন্ নিয়ে গেলো নদীর পারে—সত্যি সত্যি মেকং নদী! ফরাসী ধাঁচের বাড়ি, বাতায়ন জলের কিনারায়। পুষ্পিত লতায় জড়ানো হোটেলের থামগুলো সবুজ রঙিন, অগণ্য বাগান, ক্ষুদ্র প্যারিসের মতো ঝকঝকে দোকান, রেস্তরাঁ। ফরাসীদের প্রভুত্ব গেছে কিন্তু এখানে বেশ কিছু ফরাসী লোকজন চোখে পড়ে, কেউ দোকানী কেউবা শিক্ষক, ফিরে এসেছে বহুভাবে। মার্কিনী সৈনিক এবং কর্মচারীর দলে শহর ভর্তি। অলীকতায় ঘেরা সাইগন। ভয়ংকর অলীক, কেননা একদিকে প্রচুর মদ্যপান, উচ্চ হাস্য, ট্যাক্সির ঘন ঘন উৎপাত, অন্যদিকে কফির দোকানে বোমা ফাট্‌লো, লোকেরা উঠে গেলো (যারা বাঁচলো) অন্য কাফেতে গল্প করতে। সর্বক্ষণ যুদ্ধের খবর, গুজব ; নিশ্চয় নানাদেশীয় স্পাই, বিদ্রোহকারী ষড়যন্ত্রী, সাইকেল রিক্সায় চড়ে, পায়ে হেঁটে ঘুরছে। কে জানে। দূরে-অদূরে পক্ষ-প্রতিপক্ষের গুলি চলেছে জঙ্গলে, জোলো মাঠে মৃত্যুদূত বায়ুতরীতে উড়ে যা ফেলছে তাকে পুষ্পবৃষ্টি বলা যায় না। শান্তি, শান্তি, শান্তি। সংকল্প ছিলো বৌদ্ধ মন্দিরে যাবো, ক্যাথলিক ক্যাথিড্রালেও, যেমন ভেবেছিলাম, একটু কথা বলেই বুঝেছি, যারা যথার্থ ভক্ত, যে ধর্মেরই হোক না কেন, তারা এই সাংঘাতিক ভ্রাতৃহত্যার সম্পূর্ণ বিরোধী। কয়েক ঘর ভারতীয় ব্যবসায়ী দেখলাম সাইগনে, এবং কাছের শহর চোলন ; তাদের উপর সকলেরই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ জেনে বিশেষ তৃপ্তি হলো। বৌদ্ধ প্যাগোডায় ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তির কাছে ফিরে এলাম রাত্রে।

পূর্ব এবং পূর্ব-দক্ষিণ এসিয়ায় ছায়া জমেছে, মালয়েশিয়া থেকে

ইন্দোনেশিয়ায় ; ভিয়েৎ-নামে সব চেয়ে কালো আঁধি। কিন্তু আমরাও কি দুর্যোগ দেখিনি মাতৃভূমিতে, পেরিয়ে আসিনি দুঃখ যোগের মধ্য দিয়ে আবার শান্তির গঙ্গাতীরে? শান্তির সরস্বতী, শতদ্রু, বিপাশা যেমন আমাদের শরীরে মনে শীতল ধারা এনেছে, এখানেও মেকঙের আশীর্বাদ ফিরে আসবে। ভারতীয় প্রতিবেশী—আমরা তাই চেয়েছি, গান্ধীজি এবং উজ্জ্বলপুরুষ জওহরলাল আমাদের শিখিয়েছেন সার্বজনীন মঙ্গলের আন্তর্জাতিকতা।

যখন বলি 'মেকং-মেনাম্-ইরাবতী'—পূর্বদিনের এবং ভবিষ্যতের মূর্তি আবার চিরন্তন ইতিহাসে দেখা দেয়। কখনো মনে হয় মুক্তি-মন্ত্র, কখনো যেন দূরে শোনা শঙ্খধ্বনি—নদীর হাওয়ায়।

এসিয়ার প্রায় যে কোনো শহর ছেড়ে দু-দশ মাইল গেলেই এখনো সেই এক দৃশ্য বেশ বদ্‌লিয়ে ধরা দেয়ঃ দুঃস্থ জলাশয়, মশা, মাছির উৎসব, কাদায়-ডোবা মোষ, পাঁজরা-ওঠা গরু, বুভুক্ষু সংসারের ভাঙা কুঁড়ে ঘর। নিস্ফল ডাঙায় উড়ছে ধুলো ; নয়তো প্লাবন। কিন্তু যেমন তিস্তা মহানদীর তীরে, তেমনি সুমাত্রা দ্বীপের ইন্দ্রগিরি নদীর ধারে পূর্ব-দেশ দ্রুত জেগে উঠছে। যেমন নতুন আফ্রিকায়। মানুষের ইচ্ছাশক্তি নীল নদীর জলধারা বাড়িয়ে দিলো মিশরে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বাঁধা হবে নগরে-গ্রামে। কলকারখানায় শিল্পায়তনে আরোগ্য-ভবনে প্রাণজ্যোতি আনবার প্রভূত এই উপায়। মেকং-মেনাম্-ইরাবতী ছুটেছে সেই ডাকে, মানুষের উদ্বোধিতচিত্ত পুণ্যের ধারা বইয়ে দেবে পূর্ব-দক্ষিণে। চলো যাই, দেশে ফিরে তীর্থ করি 'আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।' বাংলার কবি বলেছেন সেই সর্বদেশের তীর্থের কথা, যেখানে সব নদী শিখেছে সমুদ্রে পৌঁছবার গতি।



নাইরোবি

মনে পড়ে মাও-মাও বিপদের সময় কিনিয়া দেশ। দুই পক্ষের ব্যবহার তখন জন্তুর চেয়ে জান্তবিক। মানুষ আমরা ক্ষেপে গিয়ে সিংহকে হারিয়ে দিই হিংস্রতায়, বাঘকে ব্যাঘ্রতায়। গায়ের রং, হঠাৎ লোভ, নকল ধর্ম বা নিছক প্রভুত্বের নেশায় বুনোর চেয়ে বন্য, হায়নার চেয়ে হন্যে হই; জাতিবিদ্বেষে এমন নিষ্ফল রী-রী করি, যা ভালুকের মুল্লুকেও অজানা। তুলনায় জিরাফ, অস্ট্রিচ্ সুস্থ, প্রকৃতিস্থ। অথচ মানুষকে দেখ স্বমহিমায়, সেখানে সংসারে প্রাত্যহিক দেবত্ব, ত্যাগে এবং বীর্যের করুণায় কীর্তিমান অগণ্য সাধারণ লোক। কিন্তু হঠাৎ মহামারী ছড়ায় ভ্রাতৃবধের, সংক্রামক ব্যাধি এখনো ঠেকানো গেলোনা।

কিকিয়ু জাতীয়েরা স্বভাবত শান্তিপ্রিয়, কর্মশীল; ব্রিটিশেরা, এমন কি তাদের বণিক সম্প্রদায়, আফ্রিকায় গেলেই যে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে তাও নয়। কাফ্রি, ভারতীয়, আরব, য়ুরোপীয়ান্ এদের পাশাপাশি সুখে থাকবার যথেষ্ট জায়গা কিনিয়ার পাহাড়তলিতে, যদি মনে থাকে সম-ভাব। কিন্তু হলো কৈ। চতুর্দিকে নীল শৈল, অরণ্য,

কফির ক্ষেত, গুল্-মোর গাছের প্রফুল্ল আগুন, এরি মধ্যে একটা ভয়ানক হানাহানি জাগলো। দেশটা আসলে যাদের সেই আফ্রিকার কাফ্রি জাতীয়েরা বহুযুগ থেকে নির্যাতিত, হয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য উগাণ্ডার হ্রদ এবং ধারের সুন্দর শহর কাম্পালা থেকে জাঞ্জিবারের লবঙ্গর বন পর্যন্ত ছড়ালো দাবানল, ওদিকে একই সংঘর্ষে লিপ্ত হলো টাঙ্গানায়িকার বিস্তৃত জনালয়, সমুদ্রতীর, প্রাচীন দারে-সালাম। পূর্ব-আফ্রিকার যাঁরা যথার্থ নেতা তাঁদের রাখা হলো হাজতে—জেলে ; শাসক-সন্ত্রাসকের হাতে বন্দুক, এরোপ্লেন।

নাইরোবিতে ঠিক করলাম সাবধানে বন্ধ গাড়িতে ঘুরে আসি কাছের রিজার্ভেশানে, সেখানে সিংহ-সিংহীর রাজত্বে নানা পশু ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাইলের পর মাইল খোলা মাঠ, কিছু জঙ্গল, মধ্যে মোটরের রাস্তা। বোঝা যায়না এ কীরকম বিরাট zoo, যার ক্ষুদ্র সংস্করণ আমাদের চিড়িয়াখানা বা প্রাণিশালা। ভাবলাম, দিগন্ত-চেরা কোনো আদিম মুক্তির খোঁজ যদি পাই পুরোপুরি জন্তুর মহলে, যেখানে অবারিত নির্মল আকাশের তলে অদম্য জীবনপ্রবাহ। প্রাণে তারই ধাক্কা লাগুক। বর্বরতা পেরিয়ে হয়তো কিছু দেখবো যা নৃশংস শহরেও শক্তি দেবে। ভাগ্য আমার ভালো, ঘণ্টাখানেক পরেই চোখে পড়লো জিব্রা, তারপরে জিরাফ, তারপর—বিশ্বাস করবে ?—ধূসর-বাদামি কেশর-ফোলানো সিংহরাজ এবং সিংহী। ভয়ার্ত এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেলো। গাড়ির জানলা-দরজা শক্ত বন্ধ কিন্তু হঠাৎ মনে হলো যেন আড়াল নেই, বেশী কাছে এসেছি। সাহসে দু-চোখ খুলে তেজপূর্ণ দুটি প্রাণীকে খুব দেখলাম, বিরাট মার্জার-বংশীয়দের চেয়েও যারা বর্বরতায় দুর্ধর্ষ হতে পারে সেই আমার মনুষ্যজাতির কথাও ভাবলাম। কিন্তু সব জুড়ে প্রাণের মায়া জাগলো। সিংহত্বের মধ্যেও শুধু রক্তপাত নয়, পারস্পরিক যুক্তভাব আছে, না থাকলে ওরা

চলো যাই

এতোদিন টিঁকতো না। মানুষ কি কখনো যুগ্মতা হারাতে পারে? ঘরে ফিরে গদ্য কবিতার ছলে কিছু লিখেছিলাম। বাংলা ভাষার কুলুপ-দেওয়া এই গুপ্ত প্রতিবাদ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছয়নি; পৌঁছলেও কারো বিঘ্ন ঘটতোনা, তারা হেসে নস্যাৎ করতো। একটু ঘুরিয়ে ধাঁধার মতো লেখা। দেখ, যদি কোনো অর্থ বেরোয়।

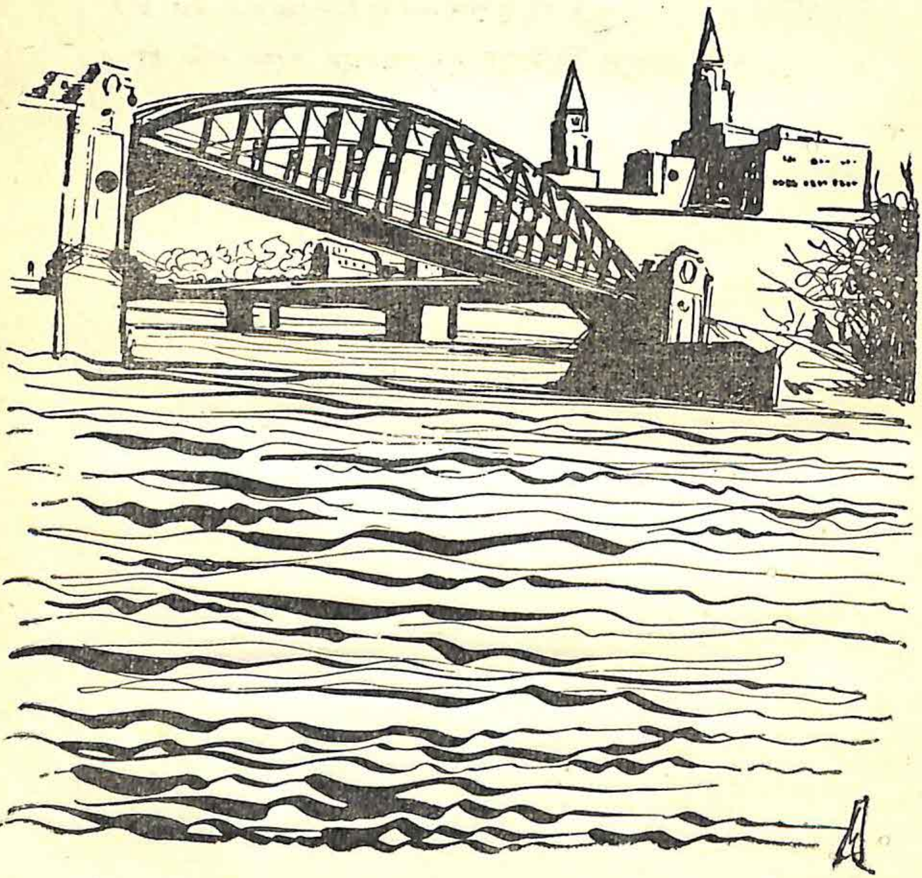
"স্টেশন ওয়াগন্"
প্রকাণ্ড কথা,
কিন্তু আফ্রিকার জন্তুঘন জনহীন প্রচ্ছন্নতায়
বাহনকে
সায়াহ্নগহনে অত্যন্ত ছোটো মনে হচ্ছিলো
যখন জানলা দরজা আঁট বন্ধ করে
ভয়ের পারে উৎসুক
বুনো গুল্মে ঘাসে খুঁজছিলাম সিংহ-সিংহী—
এবং বিশেষ করে যখন হঠাৎ চোখে পড়লো
অবিশ্বাস্য
ঐ মস্ত ভয়ানক অথচ শান্ত লাল্‌চে বেড়ালগুলো।
অস্তিত্বের অংশধারী এই দ্রষ্টার বুকে
প্রাণের দারুণ বাতাস উড়িয়ে দিলো যন্ত্র-গাড়ির আড়াল,
পূর্ণ তীব্র প্রত্যক্ষ
সহায়হীন সাহচর্যে যেন দেখছি শুধু আদিম দৃশ্য:
নিরবয়ব শূন্যে-কাটা, নিঃশ্বসিত একটি মুহূর্তে, সিংহ।
স্টেশন-ওয়াগনের কাঁচের দুইপাশে
নির্মম-মানুষ মার্জারের অবিভক্ত জগতের
ঊর্ধ্বে, নিরপেক্ষ,
আকাশ-ঢাকনার নীলে ক্ষীণ জেগে উঠলো

চৈতন্যের
কাফ্রি মহাগিরি শাদা-চূড় কিলিমাঞ্জারো।
(মানুষ-শিকার এবং সিংহ-তেজের এই দেশেও কে জিৎলো ?)

বিপ্লবের কিনিয়ায় আজ স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে। কয়েক বছর আগেও ভাবতে পারিনি, যদিও জানতাম এটা অনিবার্য। যাঁরা ছিলেন কারাগারে, তাঁরাই এখন কর্তৃপক্ষ। সমস্ত আফ্রিকায় উত্তাল স্বাধীনতার ঢেউ। কোথাও বা দড়ি বেঁধে, গ্রেপ্তার করে মানবসমুদ্রের মাঝখানে দেয়াল-গাঁথবার চেষ্টা, যেমন দক্ষিণ-আফ্রিকায়, কিন্তু সেই প্রখ্যাত কিং ক্যানুটের মতোই তারা হবে হাস্যকর, নিষ্ফল। সন্ধি-স্থাপনের বুদ্ধি মগজে ঢুকলে রঙের তারতম্য কিছু যুদ্ধের ঘটনা বলে মনে হবেনা। মনে রেখো, মহাত্মা গান্ধী এই দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রথম সত্যাগ্রহ সাধনা করেছিলেন; পশ্চিম-আফ্রিকায় সাহারার নীচে অ্যালবার্ট সোয়াইট্জর নামলেন দুর্গতের ক্ষত বাঁধতে। নরোত্তম এঁরা পুণ্যের বহ্নি জ্বেলেছেন—তার ক্রিয়া থামেনি। বহু কাফ্রি মনীষী নেতার কথা আমরা জানি, যেমন আদিবাসী এক জাতির শীর্ষস্থানীয় লুথুলি—তাঁকে বিশ্বশান্তির নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ মহাপ্রাণ অ্যালান পেটন্—তাঁর রচনায়, বক্তৃতায় তিনি নতুন আফ্রিকার সাক্ষী।

সাফারির কিনিয়া, ভ্রামণিকের নাইরোবি সাম্রাজ্য-বশ্যতার বাইরে মানুষের অধিকার পেলো। এতে ইংলণ্ডের মহিমা, আফ্রিকানের দায়িত্ব-গৌরব। আশা করি সিংহ-সিংহীরাও ভালো আছে। সভ্যতার উত্থান-পতন জোয়ার-ভাঁটার ঊর্ধে কিরীটোজ্জ্বল হিমশীর্ষ মাউন্ট্ কিলিমাঞ্জারো। চিরন্তন মানুষের, অজানিত ভবিষ্যতের যেন মুকুট।

গল্প বলে শেষ করি। অভিনয়-ক্লান্ত ছেলে-মেয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতে চায় জোড়াসাঁকো থেকে, কবিকে তারা গান শোনাচ্ছে। গানের ছত্র—'গানের পালা শেষ ক'রে দে॥ যাবি অনেক দূর'। কবি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'যাবি রে বোলপুর'। ('গানের পালা শেষ ক'রে দে॥ যাবি রে বোলপুর')। সবাই হেসে উঠলো। সাহস পেয়ে একবার একটা গভীর গম্ভীর গানকে বদ্‌লিয়েছিলাম। 'নাই যদি রোস্ নাই রবি—' তার জায়গায় হলো 'নাই যদি রোস্ নাইরোবি'— 'সেদিন নাইরোবি!' কবি শুনে হাসলেন। তখনো ওদেশে যাইনি, অনেকদিন আগের কথা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরুদ্দেশের দেশ হলো। এ সময়ে কবি থাকলে কিনিয়ার পুনরুজ্জীবনে কতো খুশি হতেন।



বস্টনে-ক্যানাডায়

চলো যাই বস্টনে, মার্কিনে। সেখান থেকেই লিখছি, যদিও। তোমরা যদি কেউ বায়ু পক্ষবর্তী অর্থাৎ প্লেনে উড়ুক্কু হও তাহলে লোগান্ এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করবো। ছ-ঘণ্টা অতলান্তিকের আকাশ পেরিয়েও মনে হবে নীচে জল, কোথায় বস্টন ? কিন্তু প্লেনের ধরা-মুখী গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেখবে সরু উঁচু বাড়ি, নদী, পার্ক, সারি গাছ দেয়া পথ, বহু ব্রিজ ঃ ভাঙা যথেষ্ট। পিপীলিকার মতো মানুষ, শব্দহীন খেলনার মোটর চলেছে ক্রমে চোখে পড়বে।

নতুন-পুরোনোয় মেশানো প্রকাণ্ড শহর ; একদিকে ইস্পাতে কাঁচে গড়া স্কাইস্ক্রেপর উঠছে, অন্যদিকে সাবেকি ইংলণ্ডের আমেজ-লাগা পাড়া। মার্কিনের সব চেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড্ নদীর পারেই (যেতে দশ মিনিট) কেম্ব্রিজে ; ন্যু-ইংলণ্ডের বৃহত্তম, বস্টন য়ুনির্ভাসিটি ; বিশ্বপ্রসিদ্ধ এম্-আই-টি যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট আয়তন—সবই বস্টনে এবং বস্টন ঘিরে আছে। হাজারে হাজারে ছাত্র-ছাত্রী, পৃথিবীর সর্বত্র থেকে উপস্থিত ; স্বাস্থ্যের, যৌবনের, উৎসাহের বন্যা বলতে পারো। আরো পাঁচ-ছটা বিশ্ববিদ্যালয়, অগণিত

স্কুল, শিশুভবন, শিল্পালয়, আরোগ্যভবন, অনুশীলন কেন্দ্র ; বিখ্যাত বস্টন ম্যুজিয়ম, যেখানে কুমারস্বামী ছিলেন—ভারতীয় ভাস্কর্য এবং চিত্রের অতুলনীয় সংগ্রহ এইখানে। সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে বস্টন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা শুনবে : শ্রেষ্ঠ ভায়োলিন্, পিয়ানো, সুর-সঙ্গত, কণ্ঠের গান তোমাদের জন্যে। কেম্ব্রিজে ক্রোগার অডিটোরিয়াম্ (মস্ত হল্) এমনভাবে তৈরী যে, আস্তে কথা বললে দূরে শোনা যায় ; এখানে রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁর বাজনা, মৃণালিনী এবং ইন্দ্রাণী রহমান-এর নাচ আন্তর্জাতিক শ্রোতা-দ্রষ্টারা উপভোগ করলো। বইয়ের দোকান, নানা-দেশী রেস্তরাঁ ছড়ানো, ছাত্রাবাস ঝলমল করছে। হঠাৎ বিজ্ঞাপনে দেখবে, মস্কো থেকে মোয়েসিয়েভের লোক-নৃত্য এলো বলে : প্রায় একশতজন রাশিয়ান মেয়ে-পুরুষ অতুলনীয় বিচিত্র প্রাদেশিক সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ছন্দে নৃত্যলোক উদ্ঘাটিত করলো, দেখতে এলো প্রায় বারো হাজার শিল্পমুগ্ধ জনতা। বস্টন গার্ডেন বিরাট ভবন—সেখানে এতো লোক একসঙ্গে বসতে পারে।

বৃহত্তম বস্টনের নদী-সাঁকোয়-ঘেরা কোণটাকে বলা হয়েছে ট্রিলিয়ন্ ডলার ট্রায়াঙ্গল্—অগাধ অর্থ-সামর্থ্য ঢালা হয়েছে সৃষ্টিশীল অগণ্য প্রচেষ্টায়। ট্রিলিয়ন বলতে কতো বোঝায় কোনো আঙ্কিক কাকার কাছে জেনে নিয়ো, নয়তো অঙ্ক কষে নিজে বার কোরো। কিন্তু মিলিয়ন-বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন যতোই হোক ব্যাপারটা শুধু ঐশ্বর্যই নয়, আশ্চর্যের মাত্রা। অধ্যয়ন, অধ্যবসায়, চিন্তা, গবেষণার জন্যে কাতারে কাতারে ডলার ঢালা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অক্লান্ত উৎসাহ, সাধনার গভীরতা।

ঐতিহাসিক বস্টনের কথা বলেছি ; প্রাচীন মার্কিন-বিপ্লবের চিহ্ন বহু প্রস্তরফলকে দেয়ালে গ্রথিত। যে-পাড়াটা ইংলণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেয় লাল ইটের বাড়িতে, ঘুরোনো পাথুরে রাস্তায় তারই পাশে ঘটেছিলো বুং-কার হিল্-এ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ; কাছেই বস্টন

টি-পার্টির বন্দর (জল সরিয়ে এখন এটা শক্ত শহরের মাঝখানে) যেখানে ইংরেজের আমদানি চায়ের বস্তা এরা ফেলে দিয়েছিলো সমুদ্রে। কিছু মাইল দূরে লেক্সিংটন্ গ্রামে দুই পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধে জিতেছিলো মার্কিন, প্রথম উড়িয়েছিলো স্বাধীনতার নিশান। কিন্তু ইংলণ্ডের সভ্যতাও টিঁকে গেলো, তার সঙ্গে মিশলো নানা য়ুরোপীয় ধারা, সব মিলে সম্পূর্ণ মার্কিন। বেশ বড়ো চীনে পাড়াও এই শহরে, শান্তিতে আছে ; উৎকৃষ্ট রেস্তরাঁয় লোকের ভিড়। বীকন্-হিল্ অংশটা উঁচু-নীচু ; সূক্ষ্ম ইটের সৌখিন পুরোনো বাড়ি, স্কোয়ার দেখে মনে পড়ে দূরের লণ্ডন। লতানো আইভি দরজায় দেয়ালে, পাড়া-পড়শির ভাববিরাজিত, উৎসবে আয়োজনে নানা পরিবারের যোগ। বিশেষ করে বড়ো-দিনের রাত্রে ; ঘণ্টা বাজিয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে অতিথি আগন্তুক সবাইকে অভ্যর্থনা করার রীতি। এইখানে থাকে বস্টন ব্রাহ্মিণ্ (ব্রাহ্মণ) অর্থাৎ অভিজাত বংশের গৌরব-মানা সম্প্রদায়, যারা ধারাবাহিক পিতৃ-পিতামহের হিসাব রেখে কথা বলে। তাদের রক্ত নীল, ব্লু-ব্লাড্, সংস্কৃতির দৈবলব্ধ বিশেষ সম্প্রদায়ের শিরায় বইছে—তাদের মধ্যে অনেকে আইরিশ ইংরেজ। বলা বাহুল্য এখানে একশো বছর বাঁচলেও সেই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব এবং নীল রক্ত পাওয়া যায় না—এটা হলো মার্কিন পূর্বজন্মের ব্যাপার। কেউ অবশ্য সত্যি সত্যি মনে করে না। তবু কথাটা ছড়িয়ে গেছে।

স্বচক্ষে দেখো, চার্ল্স্ নদীর উপর নৌকোর রেস্—বাচ্-খেলা ; বসন্তের হাল্কা রোদে হাওয়ায় প্রকাণ্ড উৎসবের মতো। তীর ভর্তি লোক, কী কাণ্ড। বাজনা-বাদ্য, চীনে বাদাম আইস্-ক্রীম বিক্রী, জেতাবার-হারাবার উৎসাহিত চীৎকার। নৌকো চলেছে বিদ্যুৎবেগের মতো, সুতনু নৌ-চালক যুবকদের গায়ে-মাথায় ঝিক্‌ঝিকে আলো, জলের ফোঁটা। এদেশে নভেম্বরের জাতীয় ধন্য-স্মরণ ঘটনা হলো

স্কুল, শিশুভবন, শিল্পালয়, আরোগ্যভবন, অনুশীলন কেন্দ্র ; বিখ্যাত বস্টন ম্যুজিয়ম, যেখানে কুমারস্বামী ছিলেন—ভারতীয় ভাস্কর্য এবং চিত্রের অতুলনীয় সংগ্রহ এইখানে। সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে বস্টন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা শুনবে : শ্রেষ্ঠ ভায়োলিন্, পিয়ানো, সুর-সঙ্গত, কণ্ঠের গান তোমাদের জন্যে। কেম্ব্রিজে ক্রোগার অডিটোরিয়াম্ (মস্ত হল্) এমনভাবে তৈরী যে, আস্তে কথা বললে দূরে শোনা যায় ; এখানে রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁর বাজনা, মৃণালিনী এবং ইন্দ্রাণী রহমান-এর নাচ আন্তর্জাতিক শ্রোতা-দ্রষ্টারা উপভোগ করলো। বইয়ের দোকান, নানা-দেশী রেস্তরাঁ ছড়ানো, ছাত্রাবাস ঝলমল করছে। হঠাৎ বিজ্ঞাপনে দেখবে, মস্কো থেকে মোয়েসিয়েভের লোক-নৃত্য এলো বলে : প্রায় একশতজন রাশিয়ান মেয়ে-পুরুষ অতুলনীয় বিচিত্র প্রাদেশিক সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ছন্দে নৃত্যলোক উদ্ঘাটিত করলো, দেখতে এলো প্রায় বারো হাজার শিল্পমুগ্ধ জনতা। বস্টন গার্ডেন বিরাট ভবন—সেখানে এতো লোক একসঙ্গে বসতে পারে।

বৃহত্তম বস্টনের নদী-সাঁকোয়-ঘেরা কোণটাকে বলা হয়েছে ট্রিলিয়ন্ ডলার ট্রায়াঙ্গল্—অগাধ অর্থ-সামর্থ্য ঢালা হয়েছে সৃষ্টিশীল অগণ্য প্রচেষ্টায়। ট্রিলিয়ন বলতে কতো বোঝায় কোনো আঙ্কিক কাকার কাছে জেনে নিয়ো, নয়তো অঙ্ক কষে নিজে বার কোরো। কিন্তু মিলিয়ন-বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন যতোই হোক ব্যাপারটা শুধু ঐশ্বর্যই নয়, আশ্চর্যের মাত্রা। অধ্যয়ন, অধ্যবসায়, চিন্তা, গবেষণার জন্যে কাতারে কাতারে ডলার ঢালা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অক্লান্ত উৎসাহ, সাধনার গভীরতা।

ঐতিহাসিক বস্টনের কথা বলেছি ; প্রাচীন মার্কিন-বিপ্লবের চিহ্ন বহু প্রস্তরফলকে দেয়ালে গ্রথিত। যে-পাড়াটা ইংলণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেয় লাল ইঁটের বাড়িতে, ঘুরোনো পাথুরে রাস্তায় তারই পাশে ঘটেছিলো বুং-কার হিল্-এ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ; কাছেই বস্টন

টি-পার্টির বন্দর (জল সরিয়ে এখন এটা শক্ত শহরের মাঝখানে) যেখানে ইংরেজের আমদানি চায়ের বস্তা এরা ফেলে দিয়েছিলো সমুদ্রে। কিছু মাইল দূরে লেক্সিংটন্ গ্রামে দুই পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধে জিতেছিলো মার্কিন, প্রথম উড়িয়েছিলো স্বাধীনতার নিশান। কিন্তু ইংলণ্ডের সভ্যতাও টিঁকে গেলো, তার সঙ্গে মিশলো নানা য়ুরোপীয় ধারা, সব মিলে সম্পূর্ণ মার্কিন। বেশ বড়ো চীনে পাড়াও এই শহরে, শান্তিতে আছে ; উৎকৃষ্ট রেস্তরাঁয় লোকের ভিড়। বীকন্-হিল্ অংশটা উঁচু-নীচু ; সূক্ষ্ম ইটের সৌখিন পুরোনো বাড়ি, স্কোয়ার দেখে মনে পড়ে দূরের লণ্ডন। লতানো আইভি দরজায় দেয়ালে, পাড়া-পড়শির ভাববিরাজিত, উৎসবে আয়োজনে নানা পরিবারের যোগ। বিশেষ করে বড়ো-দিনের রাত্রে ; ঘণ্টা বাজিয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে অতিথি আগন্তুক সবাইকে অভ্যর্থনা করার রীতি। এইখানে থাকে বস্টন ব্রাহ্মিণ্ (ব্রাহ্মণ) অর্থাৎ অভিজাত বংশের গৌরব-মানা সম্প্রদায়, যারা ধারাবাহিক পিতৃ-পিতামহের হিসাব রেখে কথা বলে। তাদের রক্ত নীল, ব্লু-ব্লাড্, সংস্কৃতির দৈবলব্ধ বিশেষ সম্প্রদায়ের শিরায় বইছে—তাদের মধ্যে অনেকে আইরিশ ইংরেজ। বলা বাহুল্য এখানে একশো বছর বাঁচলেও সেই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব এবং নীল রক্ত পাওয়া যায় না—এটা হলো মার্কিন পূর্বজন্মের ব্যাপার। কেউ অবশ্য সত্যি সত্যি মনে করে না। তবু কথাটা ছড়িয়ে গেছে।

স্বচক্ষে দেখো, চার্ল্স্ নদীর উপর নৌকোর রেস্—বাচ্-খেলা ; বসন্তের হাল্কা রোদে হাওয়ায় প্রকাণ্ড উৎসবের মতো। তীর ভর্তি লোক, কী কাণ্ড। বাজনা-বাদ্য, চীনে বাদাম আইস্-ক্রীম বিক্রী, জেতাবার-হারাবার উৎসাহিত চীৎকার। নৌকো চলেছে বিদ্যুৎবেগের মতো; সুতনু নৌ-চালক যুবকদের গায়ে-মাথায় ঝিক্‌ঝিকে আলো, জলের ফোঁটা। এদেশে নভেম্বরের জাতীয় ধন্য-স্মরণ ঘটনা হলো

থ্যাংক্স্ গিভিং ডে ; সেটা বাইরে নয়, বাড়ির ভিতরে। দরজার ধারে রাখা থাকে চিত্রিত কুমড়ো, পর্যাপ্তির চিহ্ন। বাড়ির সবাই পারলে ছুটিতে একত্র হয় বহুদূর কর্মস্থান হতে, বিদেশ থেকেও। অনেকটা আমাদের দশমীর মতো, সঙ্গে আছে খানিকটা ভাই-ফোঁটার ভাব। উপহারে, আহারে, গানে, আলোয়, পূজোয়, প্রীতিতে মেশা একেবারে খাঁটি মার্কিন উৎসবটার কথা এইখানে যোগ করলাম।

কংকর্ড্ গ্রামের ইতিবৃত্ত বস্টনেরই অঙ্গীভূত—সেখানে যে বাড়িতে এমার্সন্ থাকতেন, সেটা দেখে আসা যাক ; কাছেই থোরো-র সেই বিখ্যাত ওয়াল্ডেন্ পুকুর যার নাম জড়িত তাঁর বইয়ে। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকায় পড়েছিলেন থোরো-র অসহযোগ-বিদ্রোহনীতির কথা, তাঁর সত্যাগ্রহের আদর্শ সুদৃঢ় হয়েছিলো মার্কিনবাসীর প্রেরণায়। এখানে থামবার সময় নেই, কেননা হু-হু করে মোটরে ঘুরে আসতে হবে সমুদ্রতীর, বস্টন থেকে কাছেই যেখানে সমুদ্র পেরিয়ে মে-ফ্লাওয়ার জাহাজে এসেছিলেন মার্কিন প্রতিষ্ঠাতাদের দল। একটি জাহাজ (বড়ো মাস্তুল-দেয়া নৌকো) ঠিক ঐরকম দেখতে, প্রতীক হিসাবে এখনো তীরে রক্ষিত।

ক্যানাডার প্রত্যন্ত পশ্চিমে যাবো এই যাত্রায়, কিন্তু একবার বস্টনের আলোয়-লাগা রাত্রির নদী, আকাশে জালি-করা শহর অতৃপ্ত চোখে দেখে নিই। দুধারে নিয়ন্ দীপ-জ্বালা বে-স্টেট্ রোড, শান্ত তরু-সমাশ্রিত ; পরিচিত বন্ধু কেন্‌মোর্ স্কোয়ারকে বলি, বহু বৎসর কাটলো ভয়ংকর গাড়ির ভিড়ে চাপা পড়িনি, ঐখানে দোকানে ব্যাঙ্কে খবর-কাগজ-স্টলে কাফেটিরায় কতো ভালো লাগলো। হার্ভার্ডের উদ্দেশে বিশেষ মনে রেখেছি শতাব্দী জুড়ে ভারতের দান, অন্য সাহিত্য-দর্শন-ধর্মশাস্ত্রের ঐশ্বর্যের ধারায় যোগ হলো স্বামী বিবেকানন্দর, রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ, রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতা। ভুলিনি যে, তারো আগে রামমোহন

রায়ের সময় তাঁর মার্কিন সহযোগী রেভারেণ্ড্ অ্যাডাম্ কলকাতায় শ্রীরামপুরে গিয়েছিলেন বস্টন থেকে। ধর্মে এবং সংস্কারে অ্যাডাম্ বস্টনের য়ুনিটোরিয়ান্দের প্রতিনিধি হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত ; দু'জনের উদার ঐক্যবোধ মানবসাধনার একটি সমন্বিত আদর্শরূপ গ্রহণ করেছিলো। রামমোহন রায়ের প্রতিভা বিরাট এবং করুণায় চেতনায় গভীরতর—অতোদূর পৌঁছনো তাঁর বন্ধুর সাধ্যাতীত, কিন্তু তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ ছিলো। যদিও বস্টন থেকে নয় কিন্তু মার্কিন দেশ থেকেই আরেকটি সুন্দর সেতু বাঁধা হলো হুইটমান্-এর কাব্যে ; তাঁর প্যাসেজ্-টু-ইণ্ডিয়া সর্বজনশ্রুত। সেই কবেকার দিনে তিনি ভারতভূমিকে অভিনন্দন জানালেন। উনবিংশ শতাব্দীর দূর ভেদ করে পৌঁছলো দুই মহাদেশের চিত্তবোধ।

ভ্যানকুভর-ভিক্টোরিয়া

কিছুমাত্র কারণ নেই যদিও, কিন্তু তিন হাজার মাইল পেরিয়ে চির বাসন্তী ফুলের পাড় বসানো, প্রশান্তসাগরের ধারে নীল শৈল-জাগা, আলোর মালা-পরা বিশ্ববিদ্যালয় দেখাতে চাই। ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভ্যানকুভর শহরের অন্তর্গত। যখনই পেরেছি অতো দূরে গিয়েছি বস্টন থেকে ; অমন জ্বলজ্বলে, চারু-নির্মিত জ্ঞানপ্রতিভ নতুন য়ুনিভার্সিটি বস্টনের পরেই (অন্তত আমার কাছে) সমগ্র উত্তর মার্কিন মহাদেশের যেন অন্যত্র নেই। ওখানে—চীনে-জাপানী-ভারতীয়রা এসে মিলেছে ক্যানাডায়। আকাশ প্রসন্ন, শান্তির বেষ্টনে কঠিন-দিন কর্মের উদ্দীপনা। দ্বীপাবলী, সমুদ্রের ঢেউএ দোলা জাহাজ, অরণ্যের পর গভীর অরণ্য চক্ষে মোহ লাগায়। নদীর মোহানায় চেরা-কাঠ জলে ছড়ানো, কোথাও তীরে স্তূপ-করা, বাগানে ঘাস কার্পেটের মতো পুরু, গভীর, মর্মরধ্বনি আর ফুলের পাতার মিশ্রিত সুবাস সর্বত্র। ছেলে-মেয়ে-অধ্যাপক চোখে-মুখে হাসি এবং উৎসাহ নিয়ে ক্লাসে যাচ্ছে, লাইব্রেরিতে মাথা নীচু করে পড়ায় নিমগ্ন, মৃদু ঘণ্টার ধ্বনি ঘড়ি-ঘর থেকে বা কোনো গির্জার

প্রচ্ছন্নতা ভেদ করে সময় জানাচ্ছে। অদূরে শিখদের গুরুদ্বার। পুরোপুরি জাপানী বাগানে গিয়ে বসে থাকো, সবসুদ্ধ জাপান-থেকে আনা—পাথর, পাথুরে গাছ, ছোটো সাঁকো আর তার জল-ছবি, ঢেউ-দেয়া বালি, কাগজে কাঠে তৈরী ছবির মতো বাড়ি সাক্ষ্য দিচ্ছে সমুদ্রপার প্রতিবেশীর। বক্তৃতা শুনলাম আই-কিংএর উপর, বিখ্যাত ব্রিটিশ-ক্যানেডিয়ান অধ্যাপক বোঝাচ্ছেন অতি প্রাচীন এবং চিরন্তন ঐ চৈনিক গ্রন্থ, যাতে সময়ের বদল এবং অপরিবর্তনীয়তার সূক্ষ্মসমুজ্জ্বল কাব্য এবং দর্শন প্রতিফলিত হলো—এখনো সময়ের জাল তার স্থির পাতায় কম্পিত, চলন্ত। হিন্দু-মুসলমানের যুগ্মরচিত ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে শুধু আলোচনা নয়, ধ্বনিময় নমুনা আন্তর্জাতিক ক্লাসে পরিবেশিত হলো। তুলনাময় সঙ্গীতের অধিবেশন। বারানসীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ফরাসী সঙ্গীতজ্ঞ আমাদের রাগরাগিণীর আলোচনায় যোগ দিলেন ; মার্কিন গুণী, যাঁর বিশেষ চর্চা বালি, জাভা, সুমাত্রার ভারত-প্রভাবান্বিত ইন্দোনেশীয় সঙ্গীতে, তিনিও বললেন। বাজনার উদাহরণ শোনানো হলো—বিশেষ করে গ্যামেলনে। রবীন্দ্রনাথের গীতপ্রতিভার কথা উঠলো, 'মার্গ' এবং 'লৌকিক' দুই ধারা যেখানে তাঁর নিজস্ব অলৌকিক গানের ধারায়, নবীন-সৃজিত অথচ দৃঢ় পারম্পর্যে বাঁধা, কখনো তা পশ্চিমের ছোঁয়া-লাগা সেই প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি। একটু পরেই—সাড়ে চারটেয়—চা এলো। মার্কিনে এই রীতি নেই, তার বদলে সকাল এগারোটায় আর এক কাপ কফি। মার্কিনের কফি উৎকৃষ্ট। কিন্তু চায়ের ক্ষণিক আসরেও অপরাহ্ণের যে মাধুর্য জমে ওঠে সেটা অন্য। এখানে চা-ও সুরভি, একটু যত্নে তৈরী করা। বাইরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনতর রঙিন হয়ে উঠলো।

একদা প্রত্যূষে ভ্যানকুভর দেখেছিলাম—মনে শব্দ এলো, উদিতা। আলোর টোপর প'রে, আলোর মালা-চন্দনে সাজা কোন্ বিদেশিনী

ঋষিকন্যা স্বয়ম্বরা হলেন। চতুর্দিকে রশ্মির জয়শঙ্খ। ঢেউ দুলতে লাগলো, তাতে শহরের প্রতিচ্ছবি, হাওয়া বললো সাধু, সাধু—পশ্চিম ক্যানাডা দিগন্তে নিরুদ্দেশ হলো! আরো দূরের যাত্রী আমি। আসলে সমস্ত উত্তর মার্কিন দেশ জড়িয়ে যে-আশ্চর্য উপলব্ধি হয়েছে তারই এই ছবি।

ষ্টীমারে একটু দূর গিয়ে থামি, ভিক্টোরিয়ায়। ছোট্ট ইংরেজী শহর। ইংলণ্ড থেকে ক্যানাডায় যতো দূরে আসা যায় ততোই যেন বেশী ইংরেজী ভাব, কথার উৎকর্ষ, ফুলে-ভরা বাগান। কচি ঘাসের আস্তরণে ঢাকা, সবুজ কুয়াশার আন্দোলিত পাহাড়—যদি গল্‌ফ্‌ খেলতে চাও, তারই স্বর্গ—আমি জানিনা। তাই চলো যাই, ভিক্টোরিয়ায় হেঁটে আসি—যতোক্ষণ না শিঙা বাজিয়ে যাত্রীদের ডেকে আনে।

তার পরে, প্যাসিফিক্‌ পার হয়ে ভারতবর্ষ।